কিশোর বিস্ময়
আগষ্ট ৮৪

বিজ্ঞানের ভেলকি

ম্যাজিক ছবি ঃ

জাপানে একটি জনপ্রিয় ম্যাজিক হল, গ্লাসের নীচে ছবি ফুটে ওঠা। জলভর্তি হলেই ছবি ভেসে উঠবে নচেৎ ছবিটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। তুমিও এই ম্যাজিকটি দেখাতে পারো। একটা পুরু কাঁচের গ্লাস দরকার, যার তলদেশ হবে আঙুলের ডগার মত সরু। ১/২ বা ৩/৪ ইঞ্চি ব্যাসের একটি স্বচ্ছ কাঁচের মার্বেল এবং কুইকফিক্স বা ঐ জাতীয় সিমেন্ট চাই। মার্বেলটিকে এবার গ্লাসের মধ্যে ফেলে দাও। একটি কাঠির মাথায় কুইকফিক্স মাখিয়ে মার্বেলের গায়ে ঘষে দিয়ে মার্বেলটিকে ভাল করে আটকে দাও। এবার তোমার পছন্দ মত কোন ছবি কেটে গ্লাসের নীচে পিছন দিকে সেঁটে দাও। তারপর ছবির পেছনটা রং করে দাও যাতে ছবিটা যেন পেছন দিক দিয়ে দেখা না যায়।

এবার গ্লাসের মধ্যে তাকাও, কিছুই দেখা যাবে না। কারণ ছবিটি মার্বেলের ফোকাল লেংথ থেকে বেশ দূরে। কিন্তু যখনই জল দিয়ে গ্লাসটা ভর্তি করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা দৃশ্যমান হয়ে উঠবে বর্ধিত আকারে। এর কারণ বায়ুর চাইতে তরলের রিফ্রাকটিভ ইনডেক্স অনেক বেশী। ফলে মার্বেলের ফোকাল লেংথ বদলে দিয়ে, উত্তল লেন্সের মত কাজ করবে এবং ছবিটি দেখা যাবে বড় আকারে।

কিশোর বিস্ময়

১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা আগস্ট ঃ ১৯৮৪

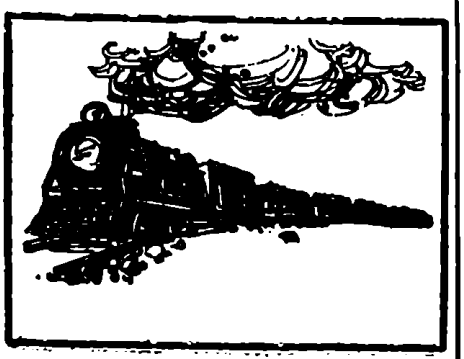

ঃ সম্পাদক ঃ
অনীশ দেব

ঃ নির্বাহী সম্পাদক ঃ
অশোক রায়

নামাঙ্কণ ঃ বিমল দাস

প্রচ্ছদ ঃ কুমারঅজিত

অলঙ্করণ ঃ সুশান্ত বিশ্বাস

সম্পাদকীয় কার্যালয়
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

অশোক কুমার রায় কর্তৃক কিশোর বিস্ময়ের পক্ষে ১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎ-কর্তৃক অনুরাধা প্রেস, ১১৭ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

১৫ সময় পর্যটক টারজান ঃ অদ্রীশ বর্ধন

বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প

১৯ লাখ টাকার আবর্জনা ঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ
৭ আয়না ঃ স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৫ ম্যাজিক রবার ঃ এনিড ব্লাইটন

বিজ্ঞান ছড়া

৬ চাঁদের দেশে ঃ হারুণ অর রসিদ

আজও রহস্য

৫১ বর্মা মুলুকের রহস্যময় জলাভূমি ঃ ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছবিতে কাহিনী ও সচিত্র বিস্ময়

১২ আইনস্টাইন ৪৮ ভয়ংকর যাত্রা ৪৭ একে চিনে নাও
১১ বিস্ময়ের নোট বই ৫০ আবিষ্কার ও আবিষ্কারক ১৪ বিশ্বের বিস্ময়

বিশেষ ক্রোড়পত্র ঃ রেলগাড়ী

২৪ কু ঝিকঝিক ঃ অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়
২৯ বিশ্ব ও ভারতীয় রেল ঃ হলধর চক্রবর্তী
৩৪ রেল নিয়ে বিচিত্র কথা ঃ জ্যোতিপ্রকাশ উপাধ্যায়
৩৮ ক্রোড়পত্র কুইজ ঃ অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা

৪১ বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথা ঃ সঞ্জয় সিংহ
৫৩ কলকাতায় প্রথম ঘূর্ণিঝড় ঃ দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
৪৪ দুর্ঘটনায় বিস্ময়কর আবিষ্কার ঃ অশোক রায়

নিয়মিত বিভাগ

৫৫ বিজ্ঞান সংবাদ ঃ সব্যসাচী সেনশর্মা
১৮ শব্দছক ঃ গৌতম ঘোষ
৫৭ ধাঁধা ঃ অজয় ঘোষ
৪৩ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান ॥ গ্যালেন ঃ দেবব্রত রায় চৌধুরী
৫৬ ইণ্ডিয়ান পায়েড হর্ণবিল ঃ সুমন চ্যাটার্জী

বিজ্ঞানের ভেলকি

৫৯ ম্যাজিক ছবি ঃ মার্টিন গার্ডনার অবলম্বনে ঃ অশোক রায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান-কল্পনার রকেটে চড়ে এক বিস্ময়কর জয়যাত্রা

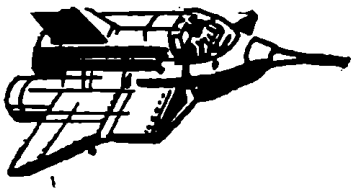

শারদীয়া কিশোর বিস্ময়

এমনটি আগে কখনও দেখোনি

৫টি উপন্যাস

সমরেশ মজুমদার (তথ্যনির্ভর অ্যাডভেঞ্চার)
অদ্রীশ বর্ধন (জুলে ভার্ণের অপ্রকাশিত অনুবাদ)
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (বিজ্ঞানভিত্তিক)
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় (কল্পবিজ্ঞান)
সিদ্ধার্থ ঘোষ (বিজ্ঞানভিত্তিক)

২টি বিজ্ঞান নির্ভর বড় গল্প

বিমল কর
বাল ফোণ্ডকে (অনুবাদ)

১০টি বিজ্ঞান সুবিবাসিত গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমরজিৎ কর আনন্দ বাগচী শেখর বসু সুব্রত সেনগুপ্ত নিরঞ্জন সিংহ রণেন ঘোষ অমর মিত্র চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ ও মারে লেইনস্টার (অনুবাদ)

একগুচ্ছ বিজ্ঞান ছড়া

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত রঞ্জন ভাদুড়ী মাখন মুখোপাধ্যায় সুরজিৎ ঘোষ মৃণালকান্তি দাশ হারুন অর রসিদ শ্যামলকান্তি দাশ ও আরো অনেকে।

বিনামূল্যে ২টি ক্রোড়পত্র

বন্যেরা বনে সুন্দর ঃ গীতা গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে বহু অভয়ারণ্য। সেই অরণ্যের কয়েকটি নিয়ে লেখিকার যাত্রা শুরু। দুর্গম পরিবেশে গিয়ে পশু-পাখির এমন সব বিচিত্র বিবরণ উদ্ধার করেছেন যা শুনলে তোমরা আশ্চর্য হবে। সঙ্গে থাকবে আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফ।

চিরদিনের সম্পদ ঃ সংকলন / দিবাকর সেন

বাংলার মণীষীদের বিজ্ঞান সাহিত্য থেকে সুনির্বাচিত ৩টি নিবন্ধ যা চিরদিনের সম্পদ। তিনজন মণীষীর নাম ঃ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও জগদানন্দ রায়।

৫টি বিশেষ বিজ্ঞান নিবন্ধ

অজয় চক্রবর্তী, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী অরূপরতন ভট্টাচার্য,
ডাঃ মনীশ প্রধান ও পার্থসারথি চক্রবর্তী

অফসেটে ছাপা রুদ্ধশ্বাস রঙিন চিত্রকাহিনী

ঘটোৎকচ

গামা রশ্মির তেজস্ক্রিয় বিকিরণে দানবে রূপান্তরিত এক মানুষের রোমাঞ্চকর কাহিনী

৮টি জানা-অজানা বিষয় নিয়ে তথ্যনির্ভর সচিত্র আলোচনা

এছাড়া থাকছে ডাঃ বেতালের ডাক্তারি ও রিলেটিভিটি নিয়ে

সরস কমিকস, কার্টুন, ধাঁধা, বিশ্বের বিস্ময়, বিস্ময়ের নোট বই আরো কত কি ?

বিশেষ আকর্ষণ
স্মরনীয় বিজ্ঞানী চিত্রমালা

প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানীদের স্মরণীয় দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র। পরমানু বোমার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা আইনস্টাইনের চিঠির প্রতিলিপি, নিউটনের প্রতিকৃতি খোদাই করা দুর্লভ সীলমোহর এরকম বহু উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র ও দলিলের অফসেটে ছাপা সংকলন। প্রত্যেকের রাখার মতো।

প্রতিযেগিতা ও পুরাস্কর

একটি নতুন ধরনের খেলা নিয়ে নতুন ধরনের বিচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন কিশোর বিস্ময়ের নিয়মিত ধাঁধার লেখক অজয় ঘোষ সঙ্গে পাবে নতুন খেলার ছক ও ঘুঁটি—বিনামূল্যে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেই পেয়ে যাবে পাঁচশো টাকা পুরস্কার।

এতোসব রাজকীয় আয়োজন মাত্র ১৮ টাকায়

প্রকাশিত হবে ১০ই সেপ্টেম্বর।

তোমার কপির জন্য হকারকে আজই বলে রাখো।

এজেন্টরা অগ্রিম অর্ডার বুক করুন।

চাঁদের দেশে বিজ্ঞানী

হারুন অর রসিদ

ধরো এক বিজ্ঞানী তার
আবিষ্কারের জোরে,
চাঁদের দেশে গড়লো মানুষ
তোমার মতো করে।
তোমার যেমন দু'হাত আছে
আর আছে দুই ঠ্যাং,
বর্ষা রাতে লাফাও তুমি
দেখলে কোলা ব্যাং।
সেখানেও বর্ষা নামে
রাত আসে দিন শেষে,
ব্যাঙের ছানা সেখানেও
বৃষ্টি ভালোবাসে।
তখন তুমি বলতে পারো
দেখলে কোলা ব্যাং,
উচ্চে কত উঠতে পারে
তোমার দুটি ঠ্যাং ?
ছ'গুণ বেশি সবাই জানে
অবাক কথা নয়,
চাঁদের দেশে যাও যদি তার
পাবেই পরিচয়।

টেলিফোন আবিষ্কার করেন গ্রাহাম বেল, ১৮৭৬ সাল।

সঠিক উত্তর দিতে পেরেছো ঃ

প্রবীর চক্রবর্তী, রথতলা, শান্তিপুর নদীয়া

স্নিগ্ধা দাশগুপ্তা, যতীন দাস নগর, বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬

তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বকর্মানগর, দুর্গাপুর ১০

শান্তনু চক্রবর্তী, শান্তিপুর, নদীয়া

জুন সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

সাধারণভাবে ধাঁধাটা সত্যি সমস্যা, কিন্তু মাঠের চেয়ে একটু বেশী এঁকে নিলে সমস্যাটা একদম জলবৎ তরলম। চিত্রে ক খ গ ধরি মাঠ, ত্রিভুজ, কখগ-এর সমান করে আরও পাঁচটা ত্রিভুজ আঁকলাম, যাতে একটা সুষম ষড়ভুজ পাওয়া যায়। এখন বৃত্তের ক্ষেত্রফল ঐ ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের ঠিক অর্ধেক হওয়া চাই। বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি r ধরি তাহলে, $2 \times \pi r^2 = 6 \times \frac{1}{2} \times 40 \times 20\sqrt{3}$ অথবা $r = 25{\cdot}7$ ফুট (প্রায়) অর্থাৎ দড়ির দৈর্ঘ্য মোটামুটি ২৫·৭ ফুট হবে।

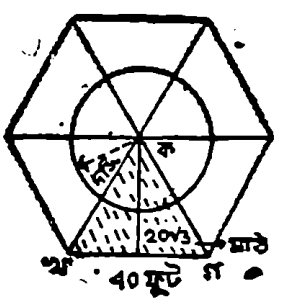

বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প

আয়না

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাপারটা আজও ভাবতে অবাক লাগে যে শেষ পর্যন্ত আমার মতো একজন কমনম্যানের সাহায্যেই কিনা এত বড় একটা সমস্যার সমাধান হোল। ওরা যে চরম সময় সীমা দিয়েছিল সেই হিসেবে আর মাত্র ঘন্টা কয়েক দেরী হলেই বিশ্বে যে কি বিপর্যয় নেমে আসতে পারতো এখন তা কল্পনা করতেও ভয় হয়।

আমি জানি আসল ঘটনাটা যে ভাবেই লিখি তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। আর প্রমান দেবার তৃতীয় ব্যক্তিও কেউ নেই—একমাত্র আমি আর আমাদের সেই আশ্চর্য বিজ্ঞানী স্যার সত্যপ্রকাশ ছাড়া।

তার চেয়ে অত ভাবনা না ভেবে ঘটনাটাই লিখে ফেলি।

মাস কয়েক আগের কথা।

কলকাতায় বসে স্যার সত্যপ্রকাশের জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে হাজির হলাম রতনপুরে। জায়গাটা রাজস্থানের উদয়পুর থেকে মাইল কয়েক দূরে একটা জনবিরল গ্রাম। প্রায় মরুভূমিই বলা চলে। এখানে গত কয়েক বছর যাবৎ বিজ্ঞানী স্যার সত্যপ্রকাশ একটা ল্যাবরেটারী বানিয়ে নিরালয় নির্জনে তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

রতনপুরে নেমে একটা টাঙ্গা নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম স্যার সত্যপ্রকাশের গবেষণা ভবনে। গবেষণা ভবন নামেই, আসলে পাঁচিল ঘেরা একতলা পুরনো একটা বাড়ী।

বাড়ীর সামনে কিছুটা বাগান। আশেপাশের অনেকটা এলাকায় কোন জনবসতি নেই। স্যার সত্যপ্রকাশ এতদূরে এমন একটা জায়গায় কেন তাঁর গবেষণাগার বানালেন সে প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আমার জানা নেই, তবে এই মানুষটিকে ইতি-মধ্যেই যারা চিনেছেন তাঁরা জানেন তিনি বরাবরই সাধারণ জীবনের সব হিসেবের বাহিরে। এই ভেজাল দেশের নির্ভেজাল বিজ্ঞানী আশ্চর্য প্রতিভা সম্পন্ন এবং সমস্ত রকম আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদ থেকে নিজেকে দূরে রেখে নিয়ত নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও রহস্যভেদ করে চলেছেন। বয়স তাঁর কেউ বলতে পারে না। তবে মাথার সমস্ত চুল, গোঁফ পেকে সাদা হলেও দেহ এখনও যথেষ্ট পটু।

কিন্তু ধান ভাঙতে শিবের গীত গেয়ে লাভ কি! প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

এবার বেশ কিছুকাল বাদে স্যার সত্যপ্রকাশের ভবনে গিয়ে হাজির হয়েছি। দেখলাম ইতিমধ্যে স্যার সত্যপ্রকাশের প্রতিষ্ঠা যতই বাড়ুক তাঁর গবেষণা ভবনটির উন্নতি কিছু হয় নি।

আমি যখন ভবনের কাছে নেমে টাঙ্গাটাকে বিদায় দিলাম—সময়টা দিনের শেষ। পশ্চিম আকাশে সূর্যের রঙিন নেশা ধরতে শুরু করেছে।

সমস্ত বাড়ীটা নিঃঝুম পুরীর মতো নিস্তব্ধ।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম। কেউ এগিয়ে এল না।

ন্যাদাটাই বা কোথায় গেল? স্যার সত্যপ্রকাশের এখানে একমাত্র সঙ্গী তাঁর বোবা কালা চাকর ন্যাদা। কই তাকেও তো দেখছি না।

সিঁড়ি দিয়ে চাতালে উঠে দরজায় হাত রাখতেই এবার একটা কণ্ঠস্বর শুনলাম,—দরজা খোলাই আছে। সোজা ভেতরে চলে এস। আমি অপেক্ষা করছি।

কণ্ঠস্বর স্যার সত্যপ্রকাশের। কিন্তু আশেপাশে তাকিয়ে ও মানুষটাকে দেখতে পেলাম না। নিশ্চয়ই ভেতর থেকে টি ভি স্ক্রিনে আমার উপস্থিতি দেখে লুকনো মাইক্রোফোন মারফৎ কথা বলছেন। কোন গবেষণা ভবনে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এবার সোজা বাড়ীর ভেতরে ঢুকে একেবারে শেষ ঘরটায় গিয়ে হাজির হলাম।

সেটা একটা বিরাট সাইজের ল্যাবরেটারী। কতরকম যন্ত্রপাতি যে আছে তার ইয়ত্তা নেই।

স্যার সত্যপ্রকাশ ঘরের দরজার দিকে পিছু ফিরে একটা বেতার যন্ত্রের সামনে বসে রয়েছেন। তাঁর ডান দিকে একটা টি ভি সেট। সেটার পর্দায় ক্ষণে ক্ষণে ল্যাবরেটারী ভবনের ভেতরের এবং বাইরের বিভিন্ন দৃশ্যপট ভেসে উঠছে।

আমি ঘরে ঢুকে কিছু বলার আগেই স্যার সত্যপ্রকাশ একই ভঙ্গিতে বসে বললেন,—পাশের চেয়ারে একটু বোস।

তোমার সঙ্গে কথা আছে। বলতে বলতেই বেতার যন্ত্রটার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন উনি। সেটা ততক্ষণে সচল হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ সময় বেতার বার্তার আদান-প্রদান চললো।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কার সঙ্গে সংকেত বিনিময় করছেন স্যার সত্যপ্রকাশ? ওঁকে এত উত্তেজিতই বা মনে হচ্ছে কেন?

এক সময় বেতার বার্তা বিনিময় শেষ হোল। তারপর স্যার সত্যপ্রকাশ আমার দিকে ঘুরে বসলেন। বললেন—তুমি আসবে আমি জানতাম। একমাত্র তোমার পথ চেয়েই আমি তিন-তিনটে দিন বসে আছি। আজ ওরা হুমকি দিয়েছে আর ছত্রিশ ঘন্টার বেশী ওরা অপেক্ষা করবে না। তারপরই নেমে আসবে পৃথিবীর মাটিতে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষটির খোঁজে। আর তার যে কি পরিণাম, বলতে বলতে নিজেই শিউরে উঠলেন স্যার সত্যপ্রকাশ।

আমি তো ও'র কোন কথাটির মাথামুণ্ডু বুঝছি না। বললাম,—ওরা কারা?

যারা একটু আগে বেতার সংকেত পাঠাচ্ছিল। ওরা এ পৃথিবীর কেউ নয় স্বপন, বলতে বলতে স্যার সত্য-প্রকাশের কণ্ঠস্বরটা কেমন রহস্যঘন হয়ে উঠলো। বললেন,—ওরা নেমে এসেছে মহাকাশের সুদূর এক গ্রহ থেকে ফ্লাইং সসার-এ চেপে।

ফ্লাইং সসার-এ চেপে। অর্থাৎ যার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা উফো, আন আইডেনটি ফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট। তাহলে সত্যিই তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে? আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলি, কিন্তু কেন, ওরা কি চায়? পৃথিবীটাকে ধ্বংস করতে?

—না, না। স্যার সত্যপ্রকাশ ঘাড় নাড়লেন,—ওরা এমনিতে খুবই ভদ্দরলোক। পৃথিবীর মানুষের কোন রকম ক্ষতি করা ওদের উদ্দেশ্য নয়। আর সে কারণেই তো ওরা যে বিপদে পড়েছে তা থেকে নিজেরাই উদ্ধারের চেষ্টা না করে পৃথিবীর মানুষের সাহায্য চাইছে বারবার।

আমি তবুও হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে স্যার সত্যপ্রকাশ এবার আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন

ওদের সে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার একমাত্র তুমি।

এবার আমি হাসতে গিয়ে বিষম খেয়ে ফেলি। কিন্তু আপাততঃ তর্ক করার সময় নেই। অতএব বলি, তাদের বিপদটা কি তা এখনও বলেন নি।

—সেই মহাকাশ আগন্তুকদের ফ্লাইং সসারটা হঠাৎ বিকল হয়ে নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে, এবং তার একটাই অর্থ আপাততঃ ওইসব প্রাণীদের নিজেদের গ্রহে ফিরে যাবার পথ বন্ধ।

—ভারী বিপদ সন্দেহ নেই, আমি বললাম, কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি কি সাহায্য করতে পারেন আর আমারই বা কি করণীয় আছে?

আসল করণীয় যেটুকু তা তুমিই করতে পার। ওদের যা দরকার সেই 'কনকেভ মিরর' গুলি আর কেউ পারবে না সাইজ মতো জয়পুরের কোন এক বিশেষ দোকান থেকে গোপনে চটপট নিয়ে আসতে—যেহেতু আমার পক্ষেও এখন এই ল্যাবরেটারী ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে এ সময় আবার ন্যাদা গেছে দেশে।

এখনও সবটাই আমার কাছে ধোঁয়াটে। বললাম—কনকেভ মিরর জিনিষটা কি?

—সোজা বাংলায় যাকে বলে 'অবতলক আয়না'। বিজ্ঞানের ছাত্র হলে বুঝতে পারতে। ওরা বেতার বার্তায় আমায় সব কিছু জানিয়েছে। স্যার সত্যপ্রকাশ ধীর স্থির ভাবে বলতে লাগলেন, গ্রহান্তরের ওইসব প্রাণীদের ফ্লাইং সসার বা উড়ুক্কুযান চলে মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে আঁজত এনার্জি থেকে বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আসা রশ্মি-কণাকে ওরা ওদের বিশেষ চুল্লি মারফৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। অসীম অফুরন্ত সে শক্তির ক্ষমতা। সেই শক্তিই উড়ুক্কু-যানকে চালিত করে মহাকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। স্যার সত্যপ্রকাশ একটু থেমে বললেন,—

ব্যাপারটা অনেকটা আমাদের সৌরচুল্লির সঙ্গে তুলনীয়, বরং আমাদের সূর্যের উদাহরণ দিয়ে বললেই বুঝতে সুবিধে হবে, অবশ্য তোমার মতো অর্বাচীনকে এসব বলে কতটা লাভ হবে, জানি না। তবু বিষয়টা সম্পর্কে দুচার কথা না বলেও পারছি না—

আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই স্যার সত্যপ্রকাশ শুরু করে দিয়েছেন,—থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন বা পরমানুকেন্দ্রিন সংযোজনের সাহায্যে সূর্য বিপুল শক্তি উৎপাদন করে চলেছে। ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে তার যেটুকু অংশ পৃথিবীতে এসে পড়ে তাতেই সারা পৃথিবীতে চব্বিশ ঘণ্টায় যত শক্তি খরচ করা হয় তার বত্রিশ হাজার গুণেরও বেশী বলা চলে। সৌরচুল্লি সম্পর্কে তোমার কোন আইডিয়া থাকলে জানতে এতে বেশ কিছু কনকেভ মিরর সারিবদ্ধভাবে থাকে। এদের সাহায্যে সূর্য রশ্মিকে কেন্দ্রিভূত করে তার দ্বারা বিপুল শক্তি সৃষ্টি সম্ভব।

আমি বললাম, তা যদি আমরা সম্ভব করতে পারি তবে তো পৃথিবীতে কোন শক্তি সমস্যাই থাকবে না।

স্যার সত্যপ্রকাশ এবার একটুকরো হেসে বললেন, সৌর শক্তিকে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর গবেষণা ইতি মধ্যেই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা শুরু করে দিয়েছেন, অবশ্য এখনও খুব কমই সার্থকতা এসেছে তবে ভবিষ্যতে এর সম্ভাবনা বিপুল। বলতে বলতে প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে উনি বললেন, আমাদের মহাকাশের আগন্তুকরা সূর্য এবং তার চেয়েও বহু লক্ষগুণ ক্ষমতাশালী সেই সব নক্ষত্রদের রশ্মি উন্নততম চুল্লির সাহায্যে কাজে লাগিয়েই সেই শক্তিতে ঘুরে বেরাচ্ছে ছায়াপথের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে।

আমি বললাম, আচ্ছা, দিনের বেলা না হয় এভাবে নক্ষত্রশক্তিকে কাজে লাগায়। কিন্তু রাতের বেলা কি উপায়?

স্যার সত্যপ্রকাশ বিরক্তভাবে বললেন, ও হে মূর্খ, মহাকাশে কি দিন রাত্তির বলে কিছু আছে? তবে উড়ুক্কু যানটি যখন কোন গ্রহের ছায়ার মধ্যে দিয়ে যায় অথবা যেখানে নক্ষত্র রশ্মির পরিমান যথেষ্ঠ নয়, সেখানে সম্ভবতঃ লিথিয়াম হাইড্রাইড এর মতো উচ্চতর আপক্ষিক তাপের কোন বস্তুকে কেন্দ্রিভূত নক্ষত্ররশ্মির সামনে রেখে দিয়ে তাদের সাহায্যে প্রচুর পরিমানে উত্তাপশক্তি শোষণ করে সে শক্তি কাজে লাগায়।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে স্যার সত্যপ্রকাশ এবার গোড়ার কথাটাই শোনালেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গ্রহান্তরের ফ্লাইং সসারটির মহাকাশ যাত্রা কালে পৃথিবীর কাছাকাছি এসে কোন দুর্ঘটনায় ভেঙে গেছে সেই উড়ুক্কুযানের নক্ষত্র চুল্লির খুব সহজ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি অবতলক আয়না এবং তারপর থেকেই গত কয়েকদিন যাবৎ সেটা পড়ে রয়েছে আমার এই ল্যাবরেটারী থেকে মাইল পাঁচেক দূরে নির্জন এক বালিয়াড়ির ওপর।

শুনতে শুনতে কেমন যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল। ঘোর ভাঙতে বলি,—তা সেই অবতলক আয়ণা তো ওরা নিজেরাই কোন দোকান-টোকানে ঢুকে যোগাড় করে নিতে বা বানিয়ে নিয়ে পারতো, তাহলে আকৃতি কি ওদের খুবই কুৎসিৎ—মাকড়সা বা উচ্চিংড়ের মতো দেখতে? মহা-

কাশের আগন্তুকদের চেহারা সম্পর্কে যে সব গল্প পড়া যায়···

—ওদের চেহারা দেখার সুযোগ আমার হয়নি, স্যার সত্যপ্রকাশ আমার কথার মাঝখানেই বললেন, তবে ওরা নিজেরাই জানিয়েছে পৃথিবীর মাটিতে, ওদের সশরীরে নেমে আসার বিপদ।

—কি বিপদ ?

—রেডিও একিটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তার মারাত্মক বিষ ছড়িয়ে পড়বে এখানকার আকাশবাতাসে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের ক্ষতি ওরা চায় না—

—তার মানে আপনি বলছেন মহাকাশের ওই সব আগন্তুকরা তেজস্ক্রিয় জীব ?

—হ্যাঁ, স্যার সত্যপ্রকাশ থেমে থেমে বললেন, ওরা নিজেরাই তা জানিয়েছে এবং এটাই ওদের জীবদেহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহাকাশে আরও কত অজানা রহস্যই যে লুকিয়ে আছে।

এরপর স্যার সত্যপ্রকাশ সেই কনকেভ মিররগুলি জয়পুরের কোন দোকান থেকে নিয়ে আসতে হবে তার ঠিকানা, পথনির্দেশ সেই সঙ্গে দোকানের মালিকের নামে আয়নাগুলির আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কিত একটি চিঠিও দিয়ে দিলেন। সেইমতো পরদিনই কাক-ভোরে যাত্রা করে রাতের মধ্যেই ফিরে এলাম সেই অবতলক আয়নাগুলি সঙ্গে নিয়ে।

স্যার সত্যপ্রকাশ উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমার হাত থেকে আয়নাগুলি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করে নিলেন। বললেন,—ওদের কথামত সময় অতিক্রম হতে আর মাত্র ঘন্টা খানেক বাকি। তারপর তেজস্ক্রীয় জীবগুলি নেমে আসবে পৃথিবীর মটিতে। সে সর্বনাশ হবার আগেই এগুলি ওদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বললাম, আমি কি সঙ্গে যাব ?

—কোন প্রয়োজন নেই। বলতে বলতেই একটা স্পেশ স্যুটের মতো পোষাক উনি চাপিয়ে নিলেন, তারপর বললেন,—এই তেজস্ক্রিয়তা নিরোধক পোষাক পরা সত্ত্বেও আমি নিজেই খুব একটা ভরসা পাচ্ছি না। এর ওপর তোমায় আর এ বিপদে সঙ্গী করতে চাই না।

সেই অবতলক আয়নাগুলি সঙ্গে নিয়ে স্যার সত্যপ্রকাশের মোটর বাইকের আলোটা দূর থেকে আরও দূরে মিলিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

সারাদিনের দৌড় ঝাঁপে খুবই ক্লান্ত ছিলাম। স্যার সত্যপ্রকাশ চলে যাবার পর বসে থাকতে থাকতে কখন যে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না।

ঘুম ভাঙলো সার সত্যপ্রকাশের দুহাতের ঝাঁকুনিতে —সুপন, ওঠ, ওঠ, চেয়ে দেখ।

চোখ মেলে তাকালাম।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি এত আলোর উৎস কোথায়। দুচোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। সেই সঙ্গে এক আশ্চর্য বিন্ বিন শব্দ। একটু ধাতস্থ হয়ে আবার তাকালাম, এক জ্যোতির্বলয় উড়ে চলেছে দূর আকাশে। কতরকম আলোই ছিটকে বেরুচ্ছে সেই উড়ন্তচাকীটা থেকে। ফ্লাইং সসার হ্যাঁ এরই তো নাম উফো-আন আইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট। তাকে আমি দেখছি দুচোখ ভরে। দুচোখ ধাঁধিয়ে সে উড়ে চলেছে দৃষ্টি সীমার বাহিরে। অনেকক্ষন বাদে স্যার সত্যপ্রকাশের দিকে চোখ ফেরালাম, উনি বললেন তোমার আনা অবতলক আয়নার সাহায্যেই ওরা ওদের উড়ুক্কু যানটিকে মেরামত করে ফের পাড়ি জমিয়েছে মহাকাশে।

আমার শেষ কৌতুহল ছিল ওদের দেখতে কেমন ?

স্যার সত্যপ্রকাশ নাক কুঁচকে উত্তর দিয়েছিলেন সে সুযোগ হয় নি। দেখার বাসনাও ছিল না।

ঘটনার পর কেটে গেছে আরও কয়েকটা মাস। আজও মাঝে মাঝে দূর আকাশে হঠাৎ উল্কাপাত দেখলে চমকে উঠি। মনে পড়ে যায় সেই আন আই ডেনটিফায়েড অবজেক্ট এর কথা।

ছবি ঃ সুশান্ত বিশ্বাস

এমন সব বিস্ময়কর রচনা তুমি ও পাঠাতে পারো। রচনা মনোনীত হলে ছাপা হবে, সঙ্গে ছবি চাই অবশ্যই।

বিস্ময়ের নোট বই

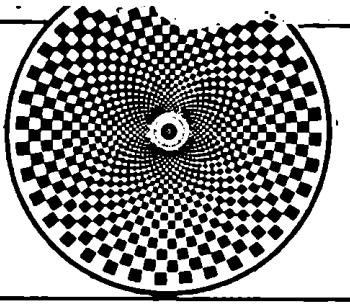

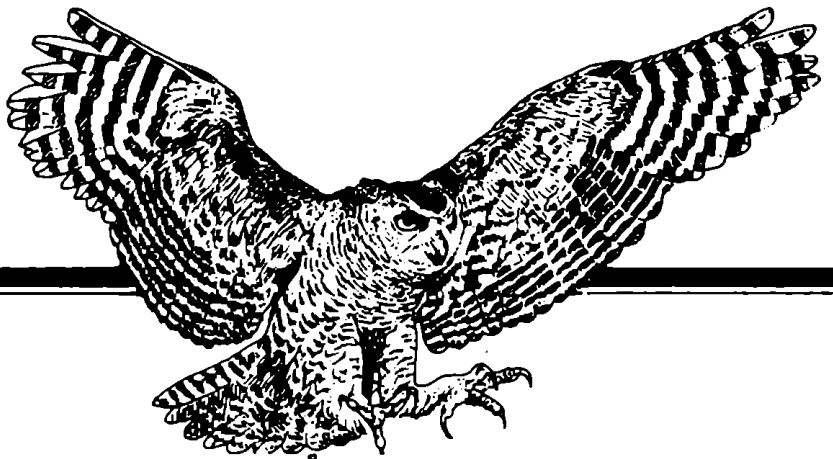

শিংওলা পেঁচার ডানার মাপ দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট। ওড়ার সময় ডানায় কোন শব্দ হয় না। এতে এদের শিকার ধরতে খুব সুবিধা। অন্ধকারে শিকারকে লক্ষ্য করে এবং সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে নখ দিয়ে আঘাত করে।

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি হামিংবার্ড। ৭৫টি হামিংবার্ডের ওজন মাত্র ১০০ গ্রাম। ঠোঁট থেকে লেজ অবধি এর দৈর্ঘ্য মাত্র ৫ সেমি: ঠিক পোকার মত মাপ।

গিলা দানবই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র বিষধর সরীসৃপ। সাপের মত এই সরীসৃপরা দংশন করে বিষ ঢালতে পারে না। এরা যখন কামড়ায় তখন দাঁতের নীচ থেকে তরল বিষ বেরোয়। এদের কামড় কিন্তু ভীষন সাংঘাতিক।

আলবার্ট আইনস্টাইন

এক বছর পর আলবার্ট কলেজে ভর্তি হতে পারলো। সে খুব পরিশ্রম করতে লাগলো কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ অগ্র ছিলো না।

ওর আমোদ প্রমোদের অনেক কিছুই ছিলো।

ঐ মেয়েটিকে অঙ্কের ক্লাসে দেখেছি।

ওর নাম মিলেভা ম্যারিক

খুব শীগগীরই মিলেভার সঙ্গে আলবার্টের অন্তরঙ্গ পরিচয় হলো।

কলেজ শেষ করেই আমি একটা চাকরি পেলেই আমরা বিয়ে করব।

আরো একজন ভালো বন্ধু ও সহপাঠী ছিলো মার্সেল গ্রসম্যান।

কতো নতুন নতুন তত্ত্ব আছে যেগুলো আমাদের চেনা পৃথিবীটাকে পাল্টে দিতে পারে। কিন্তু সে-সব তো কলেজে এখন ও পড়ানো হলো না।

নতুন নতুন তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা আর ক্লাসের পড়া, দুটো একসঙ্গে অসম্ভব।

তুই নতুন পড়াশোনা নিয়ে এগিয়ে যা। আমি ক্লাস নোট তোকে পরে ধার দেবো।

মার্সেলকে ধন্যবাদ, আলবার্ট পরীক্ষায় পাশ করলো।

১৯০০ সালের আগষ্ট মাসে কলেজের পড়া শেষ হলো।

এখন কি করবি আলবার্ট?

আমি শিক্ষক হতে চাই।

কিন্তু ছাত্র অবস্থায় আলবার্ট ক্লাসে যাওয়া পছন্দ করতো না। সুতরাং এখন কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে শিক্ষক হিসেবে নিতে চাইলো না।

আমার একটা চাকরি দরকার। কিন্তু প্রথমে আমাকে সুইজারল্যান্ডের নাগরিক হতে হবে।
এখানকার মানুষের মনে দয়া আছে, তারা স্বাধীন। জার্মানীর চেয়ে এ দেশ আমার কাছে অনেক বেশি আপন মনে হয়।
১৯০১ সালে আলবার্ট সুইজারল্যান্ডের নাগরিক হলো। এতে সে গর্ববোধ করলো, সুখী হলো।
১৯০২ সালে সুইস পেটেন্ট অফিসে চাকরি পেতে মার্সেল তাকে সাহায্য করলো।
আপনার কাজ হলো মডেল গুলো স্টাডি করা। তারপর এমন ভাবে নথিপত্র তৈরী করবেন, যাতে এ সবের আবিষ্কারকরা জালিয়াতির ফাঁদে না পড়েন।
বুঝেছি।
আলবার্টের অনেক বন্ধু জুটলো।
চাকরি করে যা পাই তাতে আমার চলে যায়। আর চাকরির সময়-টুকুতে নিজের তত্ত্ব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারি।
সুতরাং সে মিলেভাকে খবর দিলো, তারপর ওকে বিয়ে করলো।
আশাকরি তোমরা সুখী হবে।
সব সময় ওর হাতে একটা বই থাকতো।
আলবার্ট?
আরে, এসো!
পরের বছরই আইনস্টাইনের একটি ছেলে হলো, হান্স আলবার্ট।

[ক্রমশ]

বিশ্বের বিস্ময়

তুমি কি জানো অলিম্পিক শুরু হয়েছিলো ২৫০০ বছর আগে ? গ্রীক পুরাণে আছে, অলিম্পিক গেমস শুরু করেছিলো জিউসের পুত্র হারকিউলিস। রেকর্ডে জানা যায় ৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্বে অলিম্পিয়া গ্রামে প্রথম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। বর্তমান অলিম্পিকের সূত্রপাত করেন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারন দ্য কোবার্তিন নামের এক ফরাসী। এর দুবছর পরেই নতুন করে তৈরী হয় এথেন্সের স্টেডিয়াম, এখানেই বসে আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম মহড়া।

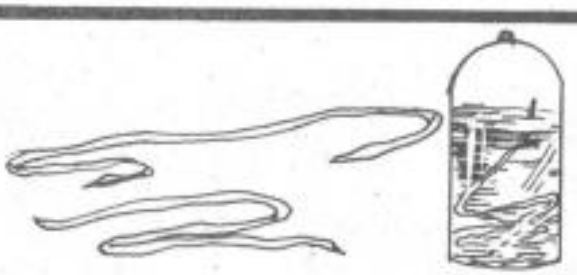

শুনলে তোমাদের চোখ কপালে উঠে যাবে, স্ত্রী ক্রিমিরা (অ্যামকারিস লুম্ব্রিকয়েড) এক বছরে ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টি ডিম পাড়ে বা দিনে ২০০,০০০টি ডিম দেয়। এরা দৈর্ঘ্যে ১৩·৭ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। আর মানুষের নানারকম অসুখের কারন ছাড়ায়।

১৯৭০ সালে ইটালির এক সার্কাস থেকে একটি সিংহ পালিয়েছিলো। রাস্তায় বেরিয়ে সিংহটি একটি বাচ্চা ছেলেকে তাড়া করতে শুরু করে। ছেলেটি ভীষন ভয় পেয়ে মায়ের কোলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারপর তার মা সিংহের ওপর ভীষন রেগে গিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এবং সিংহটিকে এমন মারে যে সিংহটির মাথা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। তাছাড়া মানসিক আঘাতও পায় বেচারা সিংহ। ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে অবশেষে সুস্থ হয়।

ধারাবাহিক উপন্যাস

[আগের কথা ঃ মানবজাতিকে বাঁচাতে, টারজানের সাহায্যের প্রত্যাশায় এসেছে ২২৬০ সাল থেকে বোরোভিয়াক। পৃথিবীর রক্ষাকবচ চারটি চাবি আছে ইলেকট্রনিক ভল্টে। প্রথম অভিযানে সাক্ষাৎ হল গুহাবাসী গ্রঙয়ের সঙ্গে। সেখান থেকে বুদ্ধিকরে ছিনিয়ে নিয়ে এল আশ্চর্য দ্যুতি সম্পন্ন এক পাথর। তারপর·····]

কব্জিবন্ধের ভৌতিক শব্দশুনে আতংকে দিশেহারা হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে গুহামানবরা। এমনকি ওংকারও ত্রাস বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। সুযোগটা ছাড়ল না গ্রঙ। সোজা ঘুসি বসিয়ে দিল ওংকারের চোয়ালে। ঘুসি-লড়াইয়ের এ-কায়দা সে রপ্ত করেছে টারজনের কাছ থেকেই। তাই মৃদু হাসি ফুটে ওঠে টারজনের ওষ্ঠপ্রান্তে।

গ্রঙ উঠে দাঁড়িয়েছে। টারজনও কব্জিবন্ধে চাবি ঠেকিয়েছে সময় ফটক উন্মুক্ত করার অভিপ্রায়ে। আরও তীব্র হয়ে উঠল গুঞ্জনধ্বনি। আরো পেছিয়ে গেছে ভীত গুহা মানবরা। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যেই গিয়ে দাঁড়ায় ওংকার। প্রত্যেকেরই বিস্ফারিত চোখে অপরিসীম আতংক !

গ্রঙ একাই কেবল নির্ভয়। দীর্ঘ পদক্ষেপে বন্ধু টারজনের সামনে এসেই ছোঁ মেরে পাথরটা কেড়ে নিয়ে তুলে ধরে মাথার ওপর। আশ্চর্য দ্যুতির ভৌতিক ছায়াপাতে অপচ্ছায়ার মতই দেখায় তার নরবানরের মত মুখাবয়ব।

গ্রঙ ভয় পায় না পাথরকে ! ভয় পায় না আওয়াজকেও ! কিন্তু এ-পাথর অলক্ষণে পাথর ! নিয়ে যাক টারজন আবার দলের রাজা হোক গ্রঙ।

প্রতিবাদ মুখর হতে গিয়েছিল ওংকার, তার আগেই পাথর টারজনের দিকে ছুঁড়ে দেয় গ্রঙ। লুফে নিয়ে কব্জিবন্ধে চেপে ধরে টারজন। কান ঝালাপালা করা তীব্র গুঞ্জনধ্বনি এবার যেন তুঙ্গে পৌঁছোয়। চমকে পেছিয়ে

যায় ওংকার, প্রতিবাদের ভাষা আর নেই।

টারজনের মুখে মৃদু হাসি। গণ্ড নির্ভীক, গণ্ড বুদ্ধিমান। দলের রাজা হওয়ার যোগ্য পুরুষ।

আচম্বিতে···

গুহার দেওয়ালে আবির্ভূত হয় দুটো জ্যোতির্ময় ঝকঝকে দরজা।

এবার পেছিয়ে যায় গণ্ড নিজেও।

বাঁ-হাতি দরজার দিকে চোকাঠ পেরোতে না পেরোতেই মনে হয় ঘূর্ণির মত পাক খেতে খেতে সরে যাচ্ছে গুহার মধ্যে থেকে। কানে ভেসে আসে শেষ চিৎকার।

"গণ্ড দুর্ধর্ষ! গণ্ড আমাদের রাজা!"

মৃত্যুর মল্লভূমি

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল টারজন প্রখর সূর্যালোকে।

এবং, প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যে।

কয়েক গজ দূরেই দুটো ঘোড়া শিরপা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে মহা আতংকে। হ্রেষারবে ঝালাপালা করে দিচ্ছে কানজোড়া।

দ্যুতিময় ফটকের মধ্যে দিয়ে আচম্বিতে আবির্ভূত হয়েছে টারজন—তাই ভয়ের চোটে প্রাণ উড়ে যাওয়ার দাখিল অশ্বযুগলের।

আচমকা চার-পায়ে খাড়া হয় তেড়েমেড়ে সামনে ধেয়ে গেল আচম্বিত ঘোড়াদুটো। সেই সঙ্গে ছিটকে গেল একটা অশ্ব-শকট। ভারী ব্রোঞ্জের বর্ম গায়ে এক জন সারথী প্রাণপণে রাশ টেনে ঘোড়া সামলানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু পাগলা ঘোড়াদের বাগে আনতে পারছে না কিছুতেই।

ঘড় ঘড় শব্দে শকট গিয়ে পড়ল একটা সুনির্মিত পথে। চক্ষের পলকে লাফিয়ে গেল টারজন সেইদিকেই—অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে। টারজন যখন দৌড়োয়, তখন বনের হরিণও হার মানে। ঘোড়া দুটোকেও পেরিয়ে গেল চোখের পাতা ফেলবার, আগেই। ধাবমান ঘোড়াদুটোকে পাশে নিয়ে ছুটল সেকেণ্ড কয়েক। পরক্ষণেই সবচেয়ে কাছের ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে উঠে বসে পড়ল দক্ষ বাজিকরের মত অনায়াসে।

রাশ টেনে ধরে, পিঠ চাপড়ে, নরম সুরে কানের কাছে কথা বলতে বলতে পাগলা ঘোড়ার পাগলামি কমিয়ে আনল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে—কমে এল গতিবেগ। পাশের ঘোড়াটারও উন্মত্ত দৌড় কমে এল সঙ্গে সঙ্গে। শ-দুই গজ গিয়ে ঘোড়া দাঁড় করাতেই থেমে গেল শকট। লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে শকটারূঢ় ব্যক্তির দিকে চোখ তুলল টারজন।

লোকটা রোমান। মাঝবয়েসী। মাথায় টারজনের চেয়ে খাটো। ঘোড়া দুটোর মতই প্রায় বেদম। শকটের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—কোনমতে হাতে লাগাম। টারজন চোখ তুলে তাকাতেই সামলে নেয় নিজেকে।

জায়গাটা নিশ্চয় ইটালীতে—খুব সম্ভব রোমের কাছেই। আন্দাজ করে নেয় টারজন।

অপরিসীম ঔদ্ধত্যে যেন সহসা ফেটে পড়ে রোমান-পুরুষ। শুধোয় কড়াগলায় রাজোচিত ভঙ্গিমায়, "কে হে তুমি? এলে কোত্থেকে?"

"ঐ তো, জঙ্গলের মধ্যে থেকে।"

শকট থেকে নেমে দাঁড়ায় রোমান পুরুষ—অদ্ভুত কাণ্ড! এত শান্ত ঘোড়া, কেন যে হঠাৎ পাগলা হয়ে গেল—"

যাক, প্রোজ্জ্বল ফটকটা তাহলে চোখে পড়েনি বীর-পুরুষের। নির্বিকার মুখে ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে যায় টারজন।

কিন্তু টারজনের আকৃতি দেখে এবার চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে রোমান ভদ্রলোকের। দীর্ঘ, পেশল বুক। ঠিক যেন ব্রোঞ্জের মূর্তি। পরনে পশুচর্মের সামান্য কটিবস্ত্র।

"জঙ্গলে ছিলে, না?" আচমকা সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে বীরপুরুষের কুচুটে চোখে। "জঙ্গলে ঢোকার আগে কোথায় ছিলে শুনি?"

কি জবাব দেবে টারজন? এমনভাবে ঘাড় ঝাঁকুনি দেয় যেন জবাবটা নিজেরই জানা নেই।

কটমট করে তাকায় রোমান পুরুষ—জানোনা? কিন্তু আন্দাজ তো করা যায়। পলাতক ক্রীতদাস, তাই না? দামীও বটে—চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে। কপাল ভালো তোমার, নুমিডিয়াসের সামনে পড়েছো···

প্রশ্ন-জাগানো ভুরু তোলে টারজন—মুখে কিছু বলে না।

যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তো যা বলি তা শোনো। ঘোড়া সামলাতে পারো ভালই—চোখেই দেখলাম। আমিও আবার রাজ-আস্তাবলের বড়কর্তা। আস্তাবলের কাজে লেগে যাও—কাউকে ফাঁস করবো না তোমার কথা। ধরা পড়লে ঘর পালানো ক্রীতদাসদের কি দশা হয় জানোতো? কোষবদ্ধ খাটো তরবারির হাতলে হাত রাখে নুমিডিয়াস।

আস্তে ঘাড় নেড়ে সায় দেয় টারজন। দ্বিতীয় চাবিটা কোথায় আছে, এখনো তা জানা যায়নি। ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে

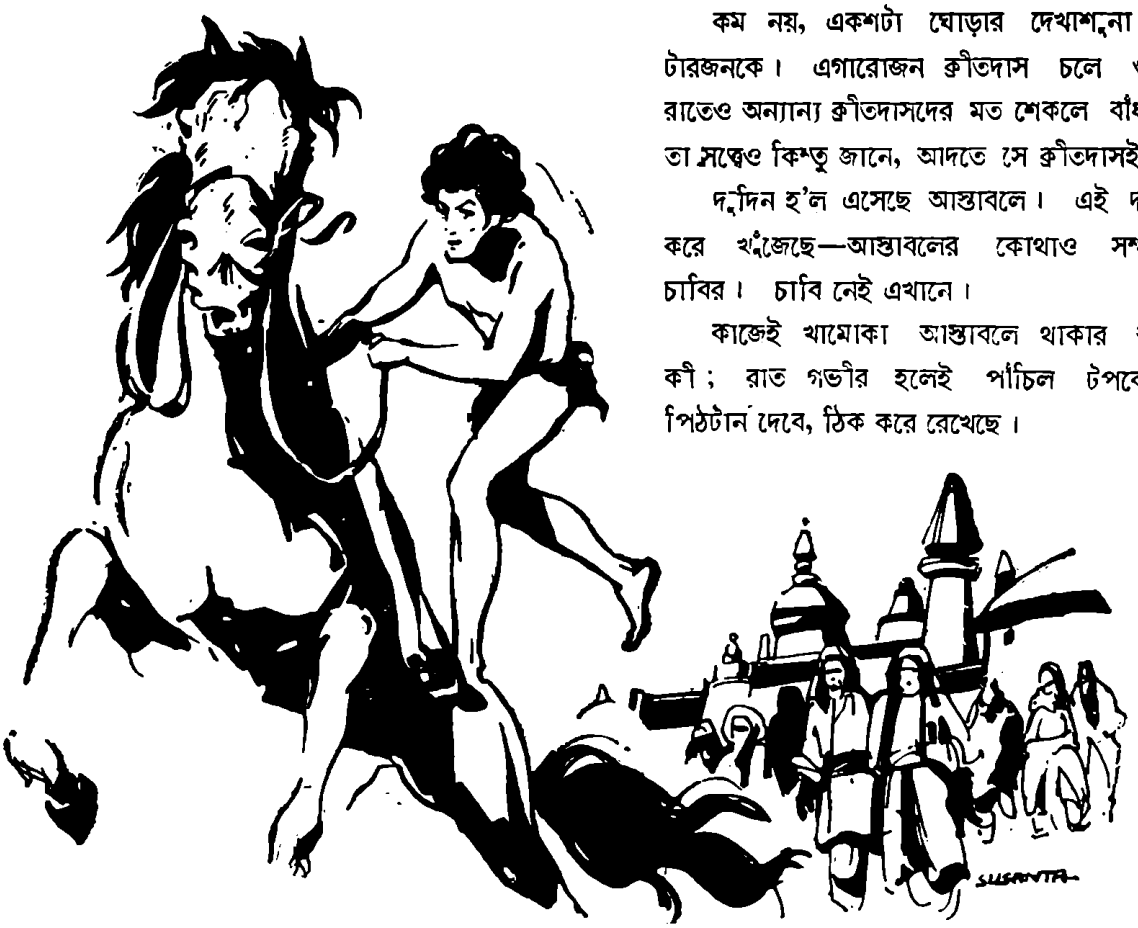

যাওয়াই মঙ্গল। পরে প্রয়োজন মনে করে আস্তাবল থেকে চম্পট দিতে কতক্ষণ? তাই নুমিডিয়াস শকট অভিমুখে অগ্রসর হতেই সুবোধ বালকের মত পেছন ধরে বনের রাজা।

দুজনে উঠে পড়ে শকটে। টারজনের হাতে লাগাম তুলে দিয়ে ঠিক পেছনে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নুমিডিয়াস—হাত রয়েছে কিন্তু তরবারির হাতলে। বেচাল দেখলেই ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা করে ছাড়বে।

কদম কদম এগিয়ে চলে অশ্বযুগল—ঘড়ঘড় করে গড়ায় শকট-চক্র।

পনেরো মিনিট পরে দেখা গেল রোম শহরকে। সাত সাতটা পাহাড় জুড়ে ছড়িয়ে বিশাল নগরীর ঐশ্বর্য। প্রখর সূর্যালোকে ঝলমল করছে সাদা মর্মর পাথর।

চিন্তায় পড়ে টারজন। বিশাল এবং জমকালো এই শহরের ঠিক কোনখানে লুকোনো আছে দ্বিতীয় চাবি, তা বার করা কি চাট্টিখানি কথা। আগের চাবি-সন্ধানীদের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে কেন, হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করে টারজন।

* *

কম নয়, একশটা ঘোড়ার দেখাশুনা করতে হচ্ছে টারজনকে। এগারোজন ক্রীতদাস চলে ওর হুকুমে। রাতেও অন্যান্য ক্রীতদাসদের মত শেকলে বাঁধা থাকে না। তা সত্ত্বেও কিন্তু জানে, আদতে সে ক্রীতদাসই।

দুদিন হ'ল এসেছে আস্তাবলে। এই দুদিন তন্নতন্ন করে খুঁজেছে—আস্তাবলের কোথাও সন্ধান পায়নি চাবির। চাবি নেই এখানে।

কাজেই খামোকা আস্তাবলে থাকার আর দরকার কী; রাত গভীর হলেই পাঁচিল টপকে চুপিসাড়ে পিঠটান দেবে, ঠিক করে রেখেছে।

এই ফন্দীই যখন আঁটছে মনের মধ্যে, হঠাৎ শোনা গেল তূর্যনিনাদ। তাকিয়ে দেখে, ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে ক্রীতদাসরা। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সারি সারি।

একজন বলে ওঠে চাপাস্বরে—"সম্রাট আসছেন! সম্রাট টাইটাস!"

সম্রাট আসছে তো বয়ে গেছে টারজনের। ঘোড়ার দলাই-মলাই চালিয়ে যায় নির্বিকারভাবে। চোখ রয়েছে কিন্তু সবদিকেই। আস্তাবলের প্রত্যেকেই শশব্যস্ত। ফটকের দিকে সদলবলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল নুমিডিয়াস। শুরু হবে এখন সমবর্ধনা—লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে শাস্ত্রীরা।

আর একবার তূর্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে ফটকের কপাট।

প্রথমে ঢুকল তূর্যবাদকরা। তারপর তিরিশজন পদাতিক সৈন্য—হাতে খোলা তলোয়ার—তালে তালে পা ফেলে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে এল আস্তাবলের ভেতরে। এদের পেছনেই দেখা গেল একটা বিরাট শিবিকা। সোনা আর ঝকমকে রত্ন থেকে রোশনাই ঠিকরে যাচ্ছে সহস্র

... চারদিক থেকে ঘিরে নিয়ে আসছে। বইছে দশজন অতিকায় আফ্রিকার ক্রীতদাস—প্রত্যেকেই যেন এক-একটা সচল পেশী-পর্বত। শিবিকার মধ্যে কোন্ মহাশয় আসীন, তাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ঝলমলে চৈনিক সিল্কের পর্দা ঢাকা থাকায়। কাতারে কাতারে ঢুকছে আরো সৈন্য—সবার পেছনে সম্রাটের নিজস্ব রক্ষী বাহিনী আসছে ঘোড়া টগবগিয়ে।

টারজন কিন্তু টাইটাসের নিজের ঘোড়া দলাই-মালাই করেছে। তাই জানে, সেই ঘোড়ার মত তেজিয়ান ঘোড়া কোনোটাই নয়।

নুমিডিয়াসের সামনে শিবিকা আসতেই সাঙ্গ-পাঙ্গ সমেত অভিবাদন জানায়। শিবিকা কিন্তু থামল না বিনয়ের অবতারদের সামনে। পেছন পেছন ছুটল নুমিডিয়াস।

সম্রাটের পার্শ্বচর বাহিনীর পোশাক অতিশয় জমকালো। কুচকুচে কালো ইউনিফর্মের ওপর স্বর্ণখচিত বর্ম আর শিরস্ত্রাণ। দেখেই চিনতে পারে টারজন—সম্রাটের প্রিটোরিয়ান গার্ড—রোমশহরের সেরা যোদ্ধার দল। শিবিকার দু-পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়াতেই আফ্রিকান ক্রীতদাস দশজন শিবিকা নামিয়ে রাখল মাটিতে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া সত্ত্বেও রেহাই পেল না। জনাকয়েক দৌড়ে গেল শিবিকার পেছনে। একটা রক্তবর্ণের গোল করে পাকানো গালিচা এনে পেতে দিলে শিবিকার পাশে। দু-জন টেনে সরিয়ে দিলে রেশমী পর্দা। তারপর দশজন ক্রীতদাসই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দু-পাশে দু-হাতে মুখ-ঢেকে। নুমিডিয়াস সামনে এগিয়ে এসে ইসারা করলে টারজান এবং অন্যান্য ক্রীতদাসদের।

ঘোড়া সামাল দিতে লাগল টারজন। পিঠে রত্নখচিত জিন চাপিয়ে দিল দু-জন ক্রীতদাস। লাগাম, বল্গা, রাশ ইত্যাদি ঘোড়ার সাজ মাথায় পরিয়ে দিল আর একজন। দু-জন দৌড়ে গিয়ে বয়ে নিয়ে এল ধাপওলা ঘোড়ায় চড়ার একটা কাঠের মঞ্চ। রাখল রক্তবর্ণ গালিচার একপ্রান্তে। সবশেষে আস্তাবলের ভেতর থেকে ঘোড়া নিয়ে বেরোলো টারজান। [ক্রমশঃ]

গৌতম ঘোষ

☐-☐☐-শব্দছক☐☐☐☐☐

সূত্রঃ পাশাপাশি

(১) তরল ধাতু মূল্যবান থার্মোমিটারে দেখতে পান। (উল্টো)

(৩) রঙ যদি চাও মজবুত, এই তেল মেশাও নিঁখুত।

(৫) ইহার মাঝে ভাসল কথা,রেডিও খুলে শুনি যথা।

(৭) স্নান করিতে নেমে জলে, চেঁচালেন ইউরেকা বলে।

(১০) রোজ ভোরে ডাকে, মাথায় ঝুঁটি থাকে।

(১২) ভেড়ার লোম পেলে, কিসের পোষাক মেলে?

(১৩) সূর্য যদি না-ই থাকে এ-পৃথিবী কিসে ঢাকে?

সূত্রঃ উপর নীচ

(১) এর ওপরে পড়লে আলো, প্রতিফলন হবে ভালো।

(২) টাকা আনার সঙ্গে চল্ ছিলো অঙ্কে।

(৩) বিদ্যুৎ বহন করে জ্বলে আলো ঘরে।

(৪) জুল ভার্নের 'ফারগুসন'এতে চেপে করেন ভ্রমন। (উল্টো)

(৬) জ্বরে গা রয়েছে তেতে, তাপমাত্রা দেখ এতে।

(৮) জলে বেড়ায় স্থলে বেড়ায় শতায়ু হয় হেলা ফেলায়।

(৯) জলাতঙ্কের ঔষধ চাই বৈজ্ঞানিক দিলেন তাই

(১০) মৌচাক হতে পেলাম ভাই স্টিক তৈরী, আলো চাই।

(১১) তিনটি সূত্র আছে ইহার, নিউটনেরই আবিষ্কার।

গতসংখ্যার শব্দ ছকের উত্তর ঃ

পাশাপাশি—২। গ্যালিলিও। ৬। কাভিয়ার। ৮। রঞ্জন ৯। ডিজেল ১০। ভর ১১। ফ্লোরিণ ১৩। কুক ১৪। টমাস ১৬। মেরী ১৭। স্টার্চ ১৮। টন ২১। লেসার ২২। বোরাক্স ২৩। তিসি ২৪। মিটনার

উপর-নীচ—১। ডেভি ৩। লিস্টার ৪। ওজোন ৫। কেপলার ৬। কাপিতজা ৭। রন্টজেন ১১। ফ্লোজিস্টান ১২। নট ১৩। কুরী ১৫। মান ১৬। মেন্ডেল ১৮। টর্লেমি ১৯। গাবোর ২০। ম্যাক্স ২১। রতি।

লাখ টাকার আবর্জনা

সিদ্ধার্থ ঘোষ

মরচে ধরা প্যাঁচানো সিঁড়িটার সামনে পৌঁছে হতাশ হয়ে ওপর দিকে তাকাল। রায় বুঝতে পারছে, তার পক্ষে অতগুলো ধাপ ভেঙে পাঁচতলার ওপরে ওই চিলেকোঠায় ওঠা সম্ভব নয়। তাহলে কি ফিরে যাবে? রাস্তার ধারে দাঁড় করানো সোলার স্কুটারটার দিকে নজর পড়ল। ব্যাটারির অবস্থা কাহিল, এখন অন্তত ঘণ্টা ছয়েক রোদ্দুরে চার্জ না করলে বাড়ি অবধি ফেরা যাবে কি-না সন্দেহ। কি কুক্ষণে যে মাথায় ঢুকেছিল শর্মার সঙ্গে দেখা করার কথা। কিন্তু দেখা না করেই বা উপায় কি! কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। তার মানে পোশাকের এয়ারকন্ডিশনারটাও ঠিক মতো কাজ করছে না। শুধু অচল আর অচল। রায়ের জীবনের চারধারে ভাঙাচোরাদের ভিড় বেড়েই চলেছে। ভিডিওকোনটা চালু থাকলে কি আর মান্ধাতার আমলের সোলার স্কুটার চড়ে খুটুর খুটুর করে আড়াই শো মাইল পেরিয়ে শর্মার সঙ্গে দেখা করতে আসত। অবশ্য ভিডিও কোনটা অচল নয়, তিন বছর ট্যাক্স দেওয়া হয়নি। কিন্তু শর্মাও যে তাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারবে, সেরকম কোন আশার আলো চোখে পড়ছে না। ওর বাসস্থানের অবস্থান তো রায়ের চেয়েও শোচনীয়। কিন্তু এত দূরে এসে দেখা না ক'রে ফেরা সম্ভব নয়।

পনের কুড়ি ধাপ উঠেই হাঁটুর ব্যথাটা টের পায় নতুন ক'রে। জিরিয়ে নিতে হয়। এক্সালেটার আর ভ্যাকোয়াম টানেলের যুগে প্রাক্তন অ্যাস্ট্রনট ভিক্টোরিয়ান আমলের কাস্ট আয়রন স্পাইরাল সিঁড়ি দিয়ে ঘামতে ঘামতে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠছে। ভাবলে হাসিও পায় আবার জেদও চেপে বসে—একটা কিছু সত্যিই করা দরকার।

এভাবে চলতে পারে না।

দরজার কাছে পৌঁছে রেলিংটা দু-হাতের মুঠোয় চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ল রায়। চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরের নীচের অর্ধেকটা, ওপর দিকটাকে যেন নীচে টেনে নামাতে চাইছে। বুক ভ'রে বার কয়েক শ্বাস নিল। অক্সিজেন সিমুলেটারের নলে মুখ গুঁজেও এখন লাভ হবে না। তিন বছর আগে শেষবারের মতো রিফিল্ করেছিল।

ঘরের মধ্যে সরকারী সিল্ ভেঙে ইলেকট্রনিক মিটারের ওপর ঝুকে বসে ছিল শর্মা। আঁতকে উঠল। নিউমেটিক চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

রীণা! রীণা! ফিসফিস করে ডাকল শর্মা। —কে এল দেখতো! এরকম নিঃশব্দে···বলে দিও আমি নেই।

রীণা শুকনো মুখে এসে দাঁড়াল কিচেন থেকে, আমার হাতে যে কেরোসিনের গন্ধ পাবে! তুমি দরজা খোলো।

—শ্ শ্! এক লাফে শর্মা ইলেকট্রনিক বোর্ডের চৌকো সবুজ সুইচটা টিপে দিল। শব্দ-নিরপেক্ষ ব্যবস্থা।

—সাত সকালে কে বলেছিল তোমায় কেরোসিন ঘাঁটতে! এখন উপায়?

শর্মার চোখে চোখ রেখে রীনা বললে, কোনো খবর তো রাখনা, গ্যাস-ক্যাপসুল আর পাঁচটা আছে। এরপর তো কাঁচা জিনিস চিবিয়ে খেতে হবে। তোমারই বা সাত-সকালে বে-আইনী রিপেয়ারিং নিয়ে বসার কি দরকার ছিল। যাও ওদিকে—আমি দেখছি।

ইন্টারকমে মুখ দিয়ে রীণা বললে, বাড়িতে কেউ নেই। আমি রাঁধুনী, দরজা খুলতে পারব না।

ভাঙা কাঁসির মতো শোনাল কথাগুলো। হাঁটুর বাতের ব্যথা ভুলে হাসি পায় রায়ের। পাঁচতলার টঙে ঘর নিয়েছে, সঙ্গে কোন হেলিপ্যাড কুকিং নেই, সেখানে রাঁধুনী আসবে কোত্থেকে। এখনত সবই হেলিকপ্টার-কুকিং সার্ভিস। নিশ্চয় বিশেষ কোন মতলব আছে শর্মার। অবশ্য শর্মা চিরকালই এই টাইপের—ভাঙবে তবু মচকাবে না। তা ভাল। যে জন্যে আসা, সেটা উদ্ধার হবে।

রায় ইন্টারকমে বলল, ওস্তাদি মারার দরকার নেই! আমি প্রোটেক্শান ফোর্সের লোক নই বাবা। মিশন স্যাটার্ন, প্রজেক্ট নাম্বার ওয়ান-জিরো জিরো-ওয়ান এর রায় বলছি।

রায়! শর্মা নিজেই এবার এগিয়ে এসে দরজা খুলল।

রীণা সরে যায় একপাশে। দুই বন্ধু কয়েক মিনিট নীরবে পর্যবেক্ষণ ক'রে একে অন্যকে।

ভিটামিন ভেকিসিয়েন্সি। ফল্টি ভিশন্—রায়ের প্রথম উক্তি।

বাত! দুটো হাঁটুই জখম মনে হচ্ছে—শর্মার সমালোচনা।

তোমরা যে ডাক্তারির কম্পিটিশন জুড়ে দিলে—রীণা বলল।

—ডাক্তারি নয়, ডাক্তারি নয়! কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা! আমাদের হাত দিয়ে কত অ্যাস্ট্রনটের লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে জানো? বলো রায়?

—ওই পুরানো কচকচানি নিয়েই থাকো। তা এতই যদি করেছ, এখন ভুলেও কেউ খবর নেয় না কেন! বেঁচে আছি না···

—নেবে নেবে! আবার খবর নেবে। আমরা বহুদিন কোন খবর হয়ে উঠিনি, তাই কেউ আমাদেরও খবর নেয় না। যাক্, বুঝলে রায়, বহুদিন চা, কফি জোটেনি···

অসম্ভব। ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ নেই। আমরা দু'মাস ধ'রে প্রায় আধকাঁচা খেয়ে আছি। রীণা কোন-রকমে ম্যানেজ ক'রে···কথা থামিয়ে সামনে ঝুকে পড়ল শর্মা। কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই জেনেও ফিস্ফিস্ করে বলল, কেরোসিন আনছে।

সেকী! ধরা পড়লে যে···

আমি একটা স্পেশাল স্টোভ বানিয়ে দিয়েছি। ধোঁয়া এবং গন্ধকে এমন ভাবে প্রসেস্ করে দেয় যে ডিটেক্টার যন্ত্র ধরতে পারে না। বাদ দাও ওসব—তোমার খবর শুনি। মাথার অর্ধেকটা দেখছি নেড়া মাঠ ক'রে ফেলেছ।

আর তুমি যে নিজের কপালটাকে রুল-টানা কাগজ বানিয়েছ। উপায় নেই ব্রাদার—আমরা দুজনে একই নৌকোয়···

ফুটো।

কি বললে?

বললাম ফুটো। নৌকোটা ফুটো। হাজার চেষ্টা করলেও শেষ অবধি ভাসিয়ে রাখা যাবে না।

যাক্, তাহলে বুঝতে পেরেছ! চলো, তাহলে নৌকোর মায়া ত্যাগ ক'রে শেষ বারের মতো আবার রকেট চাপি।

বেতের মতো লিকলিকে শীর্ণ চেহারার শর্মা এভাবে হাসির ঝড় তুলতে পারে, খুবই অপ্রত্যাশিত। রীণা

বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে।—শোনো রীণা, শোনো, রায়ের কথা শোনো। রকেট ট্রিপের কথা ভাবছে। ম্যালনিউট্রিশনে রায়ের শরীরটাই শুধু ভেঙে পড়েনি, মস্তিষ্কের ঘিলুও শুকিয়ে গেছে।

আর তোমারও কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে। না হলে রসিকতা ধরতে পার না। রীণা ধমক লাগায়। এত দিন পরে একজন বন্ধু এল, কেউ তো পা মাড়ায় না, তার সঙ্গে এরকম অভদ্রতা রীণার ভাল লাগে না। চা, কফি খাওয়াতে না পারুক, দুটো ভাল কথা বলতে তো বাধা নেই।

রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বাঁ হাত কোমরে, ডান হাত থুতনিতে ঠেকিয়ে কিন্তু কেটে-কেটে উচ্চারণ করল, আমায় পাগল ভাবার কোন কারণ নেই। চিন্তা না ক'রে আমার মতো অবস্থায় আড়াই শো মাইল পথ সোলার-স্কুটারে চড়ে আসত না। আমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সব টাকা তুলে নিয়েছি—এবং তার সবটাই ইনভেস্ট করেছি।

—কি বলছ রায়? এতো সুইসাইড।

—কিংবা ইন্ আদার ওয়ার্ডস—বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা। এটাকে কি বেঁচে থাকা বলে!

রীণার মুখে ভয়ের আভাস। শর্মার ভুরু থেকে অবিশ্বাস দূর হয়নি। বোধহয় সেটা লক্ষ করেই রায় বলল, বিশ্বাস করতে পারছ না তো। শোনো, নেভিগেটর দাস আর অ্যাস্ট্রনট ওয়েল্ডার মণ্ডল কনট্রাক্ট সই করে আমাদের টীমে যোগ দিয়েছে, শুধু···

—না! ওকে আমি যেতে দেব না। কেন আপনি ···রীণার ছেঁড়া-খোঁড়া ভয়গুলো জমে রাগের চেহারা নেয়। এই বয়সে আবার একী পাগলামি। সারা জীবন সে অনেক সয়েছে। যত বার স্পেশ ফ্লাইটে গেছে শর্মা, ততবার মহাশূন্যের নীরবতা আর অন্ধকার ভোগ করেছে রীণা। শুধু পার্সোনাল ভিডিও-র পর্দায় প্রতি দিন দু'ঘণ্টা চোখের দেখা পাওয়ার আশায় যেন শবরীর প্রতীক্ষা। কতবার মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছে শর্মা? কম করে বার পঁচিশ নিশ্চয়। শর্মা রিটায়ার করার পরে রীণার মনে হয়েছিল এতদিনে বুঝি সে সত্যিকার প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু জমানো টাকা ফুরোতে দেরী হয়নি, একের পর এক বাড়ি বদল করতে হয়েছে, তারপরে খাবারেও টান্—বছর দশেকের মধ্যে দ্রুত বদলে গেছে পৃথিবীটা, কিন্তু সে যাই হোক্—রীণা বরং সমস্ত অসুবিধা ভোগ করতে রাজী কিন্তু আর মহাকাশে ছোটা নয় আর দরকার নেই তিন চার মাসের জন্য হিরো হওয়ার, খবরের কাগজে নাম ছাপার···এত বার এত কাণ্ড করেও যদি আজ এই হাল হয়, আরেকবার চেষ্টা ক'রেই কি সুফল হবে কোনো···

নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলেছিল রীণা। তাকিয়ে দেখল, ঠাট্টা ইয়ার্কি ও অবিশ্বাসের পর্ব শেষ ক'রে দুই বন্ধুর আলোচনা এখন ক্রমশই পরস্পরের প্রতি আস্থা বাড়িয়ে তুলছে। ওদের কথাগুলো মাঝেমাঝেই রীতিমতো জটিল হয়ে উঠছে মানে বোঝা দুষ্কর।···আর কিছু না হ'ক শুধু সেলিনিয়ামের কথাই ভাবো, কি ক্রাইসিস্, অথচ···

রীণার মুখ ফুটে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল, যতই ফন্দি আঁটো, যেতে তোমায় দেবো না···

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সিগারেট ধরাল শর্মা। শুধু তাই নয়, রায়কেও অফার করেছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না রীণা। তিন মাস আগের কথা। সারা দিন চেষ্টা করেও শর্মা ধারে এক প্যাকেট সিগারেট জোগাড় করতে পারেনি। যে লোকটার দিনে দশ প্যাকেট না হলে চলত না, পয়সার অভাবে···তারপরে রীণা অবশ্য মাইনে পেয়েই সিগারেট কিনে এনেছিল। এক আধ প্যাকেট নয়, পুরো এক মাসের রসদ। কিন্তু অদ্ভুত একটা ভয় পেয়ে বসেছে শর্মাকে। সিগারেট ফুরিয়ে যাবার ভয়। প্যাকেট হাতে তোলে, নাড়াচাড়া ক'রে আবার রেখে দেয়। জিগ্যেস করলে বলে, থাক্, পরে খাব, রীণা বোঝে সিগারেট ছাড়া সে কোনো কাজে মনসংযোগ করতে পারে নি। চার পাঁচটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র সারাবার কাজ পেয়েছে যদিও সারাবার কাজ মানেই বেআইনী ব্যাপার, কিন্তু কোনটাতেই বেশী দূর এগোতে পারেনি।

শর্মাকে সিগারেট ধরাতে দেখে বুকের মধ্যে কোথায় যেন দমটা আটকে গেল রীণার। সেটা আনন্দে না যন্ত্রণায় বুঝতে পারছে না। কতদিন পরে স্বাভাবিক হতে পেরেছে শর্মা···রীণা নিঃশব্দে কিচেনে এসে ঢুকল। শর্মার তৈরী স্পোক্‌লেস্ স্টোভ ধরিয়ে চায়ের আয়োজন শুরু করে দিয়েছে।

—তাহলে তুমি রাজী?

রায়ের প্রশ্নের সুরেই বোঝা যায়, উত্তর সে পেয়েই গেছে।

—কিন্তু আমি ভাবছি, লাইসেন্স যোগাড় হবে কি করে? শর্মার মাথায় অন্য চিন্তা, আমায় দেখলেই তো আন্‌ফিট ব'লে দেবে। ওদিকে তোমার হাল'ত আমার

চেয়েও খারাপ।

—মণ্ডল আর দাসও তথৈবচ!

রায়ের কথা শুনে মনে হয় না এ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা আছে।

—তাহলে?

—তাহলে আবার কি? পুরোপুরি ফিট্ হলেও কি লাইসেন্স দিত! তুমি বোধহয় খবর রাখো না, স্পেশ ভিহিক্‌ল্ অফিস থেকে বর্তমানে অ্যাটমিক মহাকাশযান ছাড়া পারমিট দেওয়া হয় না। আমাদের তরল জ্বালানীর রকেটের কথা শুনলেই তারা শিউরে উঠবে। তাছাড়া বললামই তো, কম্পিউটার পাইলট যোগাড় করা যাবে না। তোমায় আমায় মিলে সেই আগের বারের মতো চোখ, কান আর হাতের ওপর ভরসা রেখে যাত্রা করতে হবে।

—তার মানে পুরোপুরি ইল্লিগাল্। ধরা পড়লে···

—ধরা পড়বে না। কারণ ধরার মালিক যে, সেই জোগাচ্ছে পুঁজি। না হলে, কোথা থেকে পেতাম রকেট, যন্ত্রপাতি, জ্বালানী, আয়োজনের টাকা···ব্রাদার, তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, একেবারে আটঘাট বেঁধেই নেমেছি!

অন্য কোন ভাবনায় শর্মা নিশ্চয় মগ্ন ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, তার মানে ধরে নিতে পারি কোনো গ্রাউন্ড কন্ট্রোল ছাড়াই আমাদের···

—শ্ শ্—নং সমি অব ইয়া রিম্ ঝিম্— (আন্তর্জাতিক সাংকেতিক ভাষায় বাধা দিল রায়) এসব কথা কানে গেলে মিসেস যে ভয় পাবে।

সম্মতি জানিয়ে বার তিনেক ঘাড় নেড়ে শর্মা বলল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, যে-শয়তানটা টাকা ঢালছে তার কি লাভ?

—তারই তো সবচেয়ে লাভ। কোনো রিস্ক নেই। আমাদের রোজগারের অর্ধেক সে নেবে। বাকীটা আমাদের চারজনে ভাগ ক'রে নেবো। ওর পুঁজি আর আমাদের রিস্কের এই ভাবেই বাটোয়ারা হবে।

রীনা চা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওর উপস্থিতিতে দুজনে মন খুলে কথা বলতে পারছে না। তাছাড়া ভেসে আসা এক-একটা শব্দ তাকে যেরকম বিচলিত করছে কতক্ষণ নিজেকে সামলে রাখতে পারত বলা শক্ত।

* * *

মাথায় জোড়া প্রপেলারওলা আর গায়ে সবুজ ছাপওলা চার্টার্ড হেলিকপ্টার নিউ গিনীর অরেঞ্জ রেঞ্জে চারজনকে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। ভূতাত্ত্বিক ও প্রানীতাত্ত্বিক অভিযাত্রীর দল হিসাবেই পৌছেছে ওরা। এই খান থেকে দুর্গম বনের মধ্য দিয়ে মাইল তিনেক পায়ে হাঁটার পর ওরা রকেট উৎক্ষেপন কেন্দ্রে পৌছবে। পৃথিবীর নিরক্ষরেখায় অবস্থিত সমুদ্রতলের আড়াই মাইল ওপরে এই কেন্দ্রটি দীর্ঘকাল ব্যবহার হয় নি। কংক্রিটের পথটা বুনো ঝোপের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য। কালে ভদ্রে প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাস লেখার উপাদান সংগ্রহ করতে দু' চারজন গবেষক এখানে আসে। তাদেরই কেউ বোধহয় অ্যাস্টনটসের গ্রামে যাবার এই পথটা আবিস্কার করে রাস্তার ধারে ধারে ফলক বসিয়েছিল। সেইগুলো এখন রকেট ঘাঁটির দিক নির্দেশ করেছে।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে চার জনে। চেহারা দেখে এদের নভোচর বলে সনাক্ত করা অসম্ভব। রায় খোঁড়াচ্ছে শর্মা প্রায়ই হোঁচট খাচ্ছে (চোখেও কম দেখে), দাস ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে। শারীরিক ভাবে সবচেয়ে পটু বোধহয় মন্ডল। বগলে ক্রাচ গুজে কাঠের পা খট্‌খট্ শব্দে সবার আগে আগে চলেছে সে। তাদের অভিযানের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ধারিত হবে মণ্ডলের হাতে। তার হাঁটুর তলা থেকে বাদ দেওয়া ডান পায়ের ঘাটতিটুকু মহাশূন্যের কর্মক্ষেত্র তার ভারহীনতার গুনেই পুষিয়ে দেবে।

মিনিট পনের হাঁটার পরে দম নিতে থামল সকলে।

আর কত হাঁটাবে বাবা রায়? দাস প্রশ্ন করে, রকেট অবধি পৌছতে পার'ত? নাকি দম ফেটে তার আগেই···

কি আর করা যাবে বলো! ভাড়া করা হেলিকপ্টারকে তো আর লঞ্চিং সাইটে নিয়ে আসা যেত না, জানাজানি হয়ে যাবে।

তা এমন বিদঘুটে জায়গা থেকে রকেট ছাড়ার দরকার কি ছিল? মন্ডল বলল। কেন এত জ্বালানী বাচানো হচ্ছে জানো? প্রথমত জায়গাটা পৃথিবীর ঘন বায়ুস্তরের অনেকটা ওপরে। তাছাড়া পৃথিবীর ঘন্টায় হাজার মাইল গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্বে পাক খাওয়াটাও রকেটকে সাহায্য করবে। তত্ত্বকথা আওড়ায় শর্মা।

তার চেয়েও বড় কথা, এই রকেটটা এখানেই পড়েছিল। সারানো হয়েছে। এমন কি, আন্ডার গ্রাউন্ড ট্যাঙ্কেও প্রচুর জ্বালানী ছিল। সামান্য কিছু আনতে হয়েছে। না হ'লে কি আর এমন সুযোগ আমরা পেতাম।

রায়ের এই সত্যভাষণ বোধহয় কারুরই মনোবল বাড়াতে সাহায্য করল না। কিছুক্ষণের নীরবতার পরে আবার যাত্রা শুরু হল। হাঁটতে হাঁটতেই যেন দিবাস্বপ্ন দেখছে শর্মা। আকাশ ছোঁয়া একটা বাড়ির চোদ্দ তলার

জানলায় পৌঁছতে আর পাঁচ-ছ' ফুট বাকী। মাথার ওপরে গভীর রাত্রি। পায়ের নীচে কালো শূন্যতা। শুধু ওই বন্ধ জানালার অন্য পাশে অনেক আলো। হঠাৎ পা পিছলে গেল। মুখ হাঁ ক'রেও শব্দ বার করতে পারল না। চোরের আর্তনাদের জন্য কোনো দরদ অপেক্ষা করে না। দু' হাতে কার্নিশ ধরে দোল খাচ্ছে, না শর্মা নয়, একটা দুঃসাহসী চোর। তারপর···

* * *

কোনো কাউন্ট ডাউনের মহড়া নেই, কোনো গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের বালাই নেই। বিদায় জানাবার জন্য কেউ অপেক্ষা করছিল না, তবু প্রত্যেকেই হাত নেড়ে অনুষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করেছে। যে যার সীটে শুয়ে পড়ল। শর্মা চালু ক'রে দিয়েছে অয়েল পাম্প। শুরু হয়ে গেছে স্পন্দন। জীবন্ত হয়ে উঠছে বুড়ো রকেটটা। লাল সুইচটার ওপর হাত রেখে শর্মাও শুয়ে পড়ল। তার স্ট্র্যাপ আঁটতে সাহায্য করছে রায়।

রেডি!

বুস্টার রকেটের কান-ফাটানো শব্দ আর শরীরের ওপরে ত্বরণের মণ মণ চাপ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। তারপরেই একটু হালকা ভাব। একটু ঝাঁকানি দিয়ে রকেট থেকে খসে পড়ল জ্বালানীর খালি ট্যাঙ্কটা। প্রশান্ত মহাসাগরে সামান্য একটু ঢেউ উঠবে।

এবার রকেটের নিজস্ব ইঞ্জিনের গর্জন। টি-ভি স্ক্রীনে চোখ রেখে ব্যস্ত হাতে একের পর এক কণ্ট্রোল প্যানেলের সুইচ গীয়ার নিয়ন্ত্রণ ক'রে যাচ্ছে শর্মা। ঠিক সেই পনের বছর আগেকার নিপুণতা ফিরে পেয়েছে।

না! না! —হঠাৎ নেভিগেটার দাসের আর্তনাদে পাশ ফিরে তাকাল। দাস ঝুঁকে পড়েছে রায়ের ওপরে। স্পেশস্যুটের এক পাশ দিয়ে লাল রক্তের ধারা ছড়িয়ে পড়েছে।

নির্বিকার কণ্ঠে মণ্ডল বলল, স্পেশস্যুটের ইয়ার প্লাগ নিশ্চয় ডিফেক্টিভ ছিল। তাছাড়া ব্লাডপ্রেসারও নিশ্চয় বেশী ছিল রায়ের। ভাগ্যিস, আমাদের কারুর ভাগ্যে ওই রকম পুরনো বাতিল পোশাক জোটেনি, তাহলে এইখানেই যাত্রার ইতি হয়ে যেত। আমি মরলে কে উপগ্রহ কাটা-ছেঁড়া করত, নেভিগেটার বা ইঞ্জিনীয়ার মরলেও বিপদ ছিল···

দাস আবার আর্তনাদ ক'রে উঠল, ডেড্! হি ইজ ডেড্।

দাস্! গম্ভীর আদেশ এল শর্মার, টেক চার্জ। ছেলেমানুষী ক'রো না, যে গেছে সে গেছে, আমরা তিন জন তো আছি এখনও!

ফিরে চলো শর্মা! প্লিজ মণ্ডল, আই ওয়াণ্ট টু গো ব্যাক্।

—ইম্পসিবল! তা হয় না। তুমি জানো তা সম্ভব নয়।

দাস কণ্ট্রোলের চার্জ নিল।

এখন শর্মা কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। নোজ স্টিয়ারিং রকেট ছুড়ে দাসকে এখন মহাকাশযানকে নির্দিষ্ট কক্ষে স্থাপন করতে হবে, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার গতি, তারপর স্থাপন করতে হবে পৃথিবীর ছায়ায়, পরিত্যক্ত একটি কৃত্রিম উপগ্রহের কাছে। এমন কিছু দুরূহ ব্যাপার নয়। মাইক্রোপ্রসেসরে প্রোগ্রাম একটা করাই আছে।

রায়ের দিকে তাকাল শর্মা। আশ্চর্য, ভয়, দুঃখ কি যন্ত্রণা কিছুই অনুভব করল না! শুধু মনে পড়ল, পনের দিনের মধ্যে ফিরতে না পারলে, রীণা একটা চিঠি পাবে। সে ব্যবস্থা করেই এসেছে। রীণাকে অনর্থক কষ্ট দিতে চায় না। দুঃসংবাদ যদি থাকে, যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ততই ভাল। দুর্বিসহ প্রতীক্ষার পর্বটা তো সংক্ষিপ্ত হয়।

টি ভি-র পর্দায় ফুটে উঠল কস্‌মো ৯৫৭'-এর প্রতিবিম্ব। পর্দার ডান কোণে একটি বিন্দু এবার রকেটের দিক্ পরিবর্তন ক'রে বিন্দুটাকে নিয়ে আসতে হবে পর্দার ঠিক কেন্দ্রে, চেরা দাগটার কেন্দ্রে। তারপর শুরু হবে মণ্ডলের খেলা।

প্রশংসা করতে হয় দাসকে। প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যেও সামান্য জ্বালানী খরচ করেই মহাকাশযানকে সে লক্ষ্যে নিয়ে এসেছে।

মহাশূন্যে ভ্রমণের পোশাক প'রে এয়ারলকের গোলাকার দরজা ও সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে গেল মণ্ডল তার ওয়েল্ডিং-কাটার নিয়ে। পরিত্যক্ত কৃত্রিম উপগ্রহ ৯৫৭কে সে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে তার থেকে সংগ্রহ করে আনবে দুর্মূল্য সেলিনিয়াম ও আরও অনেক ধাতু ও যন্ত্র। তারপর সেই মানিমানিক্য বোঝাই ক'রে ফিরবে তারা পৃথিবীতে। আর বোধহয় কখনও এমন ঝুঁকি নিতে হবে না, চোরের মতো জীবনযাপন করতে হবে না, বেআইনী কাজ ক'রে সংগ্রহ করতে হবে না জীবিকা···

অবজারভেশান জানলায় চোখ রেখে মণ্ডলের কাজ দেখছিল শর্মা। সৌর-ব্যাটারী বসানো একটা পাখনা

খুলে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। শর্মা ভাবছিল, নিজেদের চোর মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মহাকাশে গত পঁচিশ বছর ধরে যত আবর্জনা জমেছে, কেউ তো পরিষ্কার করার চেষ্টা করেনি আজ অবধি। যদিও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে এ নিয়ে লেখালিখি কম হয় নি। কাজেই আজ যদি তারা একটা বাতিল যন্ত্রকে কেটেকুটে সরিয়ে দেয় তাতে তো সবারই উপকার। মন্ডল ব্যাক্‌প্যাক্‌ রকেট-গান ছুঁড়ে সরে গেল এক পাশে। মহাকাশের উজ্জ্বল অন্ধকারে তার চারধার জুড়ে এখন অগুন্তি নক্ষত্রদের অপূর্ব দৃশ্য। এখানে তারারা টুইংকিল-টুইংকিল করে না। কিন্তু মহাকাশ দৃশ্য দেখে মোহিত হওয়ার অবসর নেই মন্ডলের।

—মন্ডলকে ডেকে নাও শর্মা!

দাসের ঠাণ্ডা শান্ত গলা যেন ছুরির মত বিঁধল শর্মাকে। এর আগে তার উত্তেজনা বা আর্তনাদও কিন্তু এভাবে নাড়া দেয় নি। ফিরে তাকাল।

দাস ফুয়েল ইন্ডিকেটারের দিকে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এক ফোঁটা জ্বালানী অবশিষ্ট নেই।

শর্মার নির্বাক দৃষ্টির উত্তরে দাস শুধু বলল, মিটারটা প্রথম থেকেই কাজ করছিল না। তাই এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। কিন্তু ট্যাঙ্ক যে পুরো ভর্তি ছিল, সে তো তুমি নিজেই পরীক্ষা করেছো।

—করেছি, কিন্তু জ্বালানীর মান তো পরীক্ষা করিনি। নিম্নস্তর গ্রেড ঠিক ছিল না তাই থ্রাস্ট ডেভালাপ করতে যা দরকার তার চেয়ে বেশী জ্বালানী পুড়েছে।

মন্ডলকে ডেকে নাও শর্মা, আর লাভ কী! খামোখা পরিশ্রম করে।

তবু অবজারভেশন জানলায় চোখ রেখে বসে রইল শর্মা। বিদায় নেবার সময় ছোট্ট একটা টবে গোলাপ গাছের কুঁড়িটাকে দেখিয়ে রীনা বলেছিল তুমি ফিরে এসে টুকটুকে লাল একটা ফুল দেখতে পাবে।

—খুব মজা লাগছে, না? বিকৃত শোনাল দাসের রূঢ় কণ্ঠ। ঐ লোকটা এখনো জানে না, হাজার মাল বোঝাই করুক, যত দামী মালই সংগ্রহ করুক, আমাদের জীবন এইভাবে পৃথিবীর চারিধারে পাক খেতে খেতেই ফুরিয়ে যাবে। পৃথিবীর দিকে মুখ ফেরাবার আর কোন উপায় নেই। একজন মরা মানুষ আর যক্ষের মত আগলে……না, না, শর্মা আমি বলছি, ওকে ডেকে নাও। মন্ডলের সঙ্গে এরকম ইয়ার্কি…আমি সহ্য করতে পারছি না।

দাস হঠাৎ জাপটে ধরেছিল শর্মাকে। এক ঝটকায় ছিটকে দিল তাকে শর্মা। ভারশূন্যতা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অন্যধারে। দাঁতে দাঁতে টিপে শর্মা বলল, ডোন্ট বি স্টুপিড্‌। মন্ডল এখনও বেঁচে আছে। যতক্ষণ না জানতে পারছে ফেরার উপায় নেই, ততক্ষণই বেঁচে থাকবে। কেন, কেন আমরা ওকে আরও কিছুক্ষণ বাঁচার সুযোগ দেব না!

মিনিট কয়েকের নীরবতার পরে দাস বলল, ঠিকই ঠিকই বলেছ শর্মা, আমারই ভুল।

মন্ডলের কাজ শেষ হয়েছে। বায়োনিক কৃত্রিম হাত মহাকাশযানের কার্গো-বে'র মধ্যে গুপ্তধন বোঝাই করা হল। এয়ার-লক্‌ পেরিয়ে মন্ডল ভেতরে ঢুকল। মুখে বিজয়ীর হাসি।

শর্মা দাসের দিকে তাকাল। দাস মুখ ফিরিয়ে নিল।

ব্যাপার কি? দু'জনেই বোবা হয়ে গেলে নাকি! —মন্ডল হাসতে হাসতেই বলল।

আবার নীরবতা। কে দেবে দুঃসংবাদ? মৃত্যুর বার্তা।

ও! বুঝেছি। তাহলে এতক্ষণে জানতে পেরেছ তোমরা? —মন্ডলের কথা শুনে দু'জনেই ফিরে তাকাল। কি বলছে মন্ডল!

—আমি তো আগেই জানতে পেরেছি যে, আমরা আর ফিরতে পারব না। ইচ্ছে ক'রেই বলিনি, বলে তো লাভ নেই।

—তাহলে, তাহলে, তুমি শুধু এই সেলিনিয়াম সংগ্রহ করার জন্যে…

—না, শুধু শুধু নয়। আমি জানি, কাল হ'ক বা পরশু, আবার কেউ না কেউ আসবে, ঠিক আমাদেরই মতো মহাকাশের আবর্জনা ঘেঁটে কিছু কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাদের কথা ভেবেই কাজটা একটু এগিয়ে রাখলাম। আমাদের পরিত্যক্ত মহাকাশযানটার যদি কেউ খোঁজ পায়, খুব অল্প পরিশ্রমেই তারা সফল হবে… শর্মা চোখ বুঁজে বিড়বিড় ক'রে আওড়াচ্ছিল, রীণা তোমার লাল গোলাপটা মন্ডলকেই দিও। ওটা ওরই প্রাপ্য।

ছবি, সুশান্ত বিশ্বাস

সঞ্জয় সিংহ

বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথা

কলকাতায় অজস্র মানুষের ভীড়ে, মোটর-বাসের পোড়া পেট্রোল-ডিজেলের ধোঁয়ায়, ঘিঞ্জি পরিবেশ। কিন্তু এরই মধ্যে, এই কলকাতার আশে পাশেই এমন সব জায়গা ছড়িয়ে আছে যেখানে প্রান খুলে একটু নির্মল বাতাস নিঃশ্বাসে নেওয়া যায়। ঠিক এমনই এক জায়গা, কলকাতার পাশেই হাওড়ার শিবপুর হুগলী নদীর গা ঘেঁষে, গাছপালাদের বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে যার পোশাকী নাম, 'ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন'। চলতি কথায় সবাই যাকে বোটানিক্যাল গার্ডেন বলেন।

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগেকার ঘটনা। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল। সাল ১৭৮৬, বৃটিশ পদাতিক বাহিনীর লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল রবার্ট কীড কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডকে এইমর্মে একটা চিঠি লিখলেন, যে কলকাতায় যদি এমন একটা বাগান করা যায় যেখানে খোলা জায়গায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে বেড়ানো যাবে, আর প্রয়োজনীয় কিছু মসলাপাতি যেমন লবঙ্গ, দারুচিনি, চা, কফি ইত্যাদির জন্য ডাচ্ ওলন্দাজ, সিংহল প্রভৃতি দেশের মুখ চেয়ে না থেকে, যদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গাছ, লতা, গুল্ম অনুসন্ধান করে নিয়ে এসে এই বাগানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চাষ করা যায় এবং একটা পরীক্ষমূলক বাগান করা যায়, তবে বৃটেনের ধনসম্পদ যেমন বাড়বে, তেমনি ভারতবর্ষের অধিবাসীরাও উপকৃত হবেন। কীড সাহেবের চিঠি পেয়ে কোম্পানীর পরিচালকরা লণ্ডনের সরকারী বোটানিক বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কসের সঙ্গে পরামর্শ করে বাগান করার জন্য সম্মতি জানালেন। বাস, স্থানীয় বৃটিশ সরকার বাগানের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হলেন। ১৭৮৭ সালে, রবার্ট কীডের পরিচালনায় ১১২ হেক্টর জমি নিয়ে গড়ে উঠলো, "বোটানিক গার্ডেন।" রবার্ট কীড যদিও একজন সৈনিক ছিলেন কিন্তু গাছপালা উদ্ভিদের সঙ্গে তাঁর এক নিবিড় সম্পর্ক তাই তৎকালীন বৃটিশ সরকার কীড সাহেবকে বাগানের অবৈতনিক সুপারিটেণ্ড বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

এরপর রবার্ট কীড মারা গেলেন। সময়টা হলো ১৭৯৩ সাল। বোটানিক গার্ডেনের পরিচালনার ভার নিতে এলেন ডাঃ উইলিয়াম রক্সবার্গ। রক্সবার্গ কীডের স্বপ্নকে সফল করার জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ, গাছপালাতো বিদেশ থেকে আনালেনই, তার উপর উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে শুরু করলেন গবেষণা। ক্রমে বাগানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দেশবিদেশে। পরবর্তীকালে উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে রক্সবার্গের ঐ গবেষণার ফলে বহু উদীয়মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছেন। তাই রক্সবার্গকে "ফাদার অব ইণ্ডিয়াণ বোটানি" বা ভারতীয় উদ্ভিদ বিদ্যার জনক বলা হয়। তারপর ডাঃ নাথানিয়েল

ওয়ালিচ, হিউ ফকনার প্রমুখ উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা এই বাগানের অধ্যক্ষ হন। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সালে 'বোটানিক গার্ডেন' নাম বদলে যায়, হয় 'রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন'। দেখতে দেখতে দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি এই বাগানের নামকরণ হয় আজকের, "ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন" নামে।

পুরো বোটানিক্যাল গার্ডেনটি পঁচিশটি ভাগে বিভক্ত কোন ভাগে রয়েছে আমাদের দেশের পাঞ্জাব, হরিয়াণা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের দুষ্প্রাপ্য গাছ। উদ্ভিদ, লতা, আবার কোন ভাগে হাণ্ডুরাস, আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ থেকে তুলে আনা গাছ পালা। সব মিলিয়ে প্রায় ছাব্বিশ লক্ষের মতো নানা প্রজাতির বিভিন্নরকম গাছ লতা গুল্ম এই বাগানের শোভা বর্ধন করছে। এই পঁচিশটি বিভাগকে জোড়া রয়েছে ঝক্‌ঝক্‌ তক্‌তকে পিচের রাস্তা দিয়ে এক একটি রাস্তার নাম এখন পরিবর্তন অধ্যক্ষ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বা চিকিৎসকের নামে যেমন কিড অ্যাভেনিউ, হ্যামিলটন অ্যাভেনিউ ইত্যাদি। মাঝে মাঝে রয়েছে লিলিপুটের মতো ছোট ছোট লেক পুকুর। সেইসব লেকের কয়েকটিতে রয়েছে লাল সাদা বাহারী জলীয় লিলি বা শালুক ফুল যাদের এক একটা পাতা আগেকারদিনে রাজারাজরাদের বাড়ির বড় বড় থালার মতো। যার উপর একটা তিন চার বছরের বাচ্চাকে অনায়াসে বসিয়ে রাখা যায়। এই জলীয় লিলির বৈজ্ঞানিক নাম "ভিক্টোরিয়া অ্যামাজুনিকা" গাইড বুকে এই লিলিদের অভিহিত করা হয় দৈত্যকার লিলি বলে।

বোটানিক্যাল গার্ডেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আলোচিত গাছ-হলো সেই বিখ্যাত বটগাছ, যদিও প্রায় দুশোবছরের এই বটগাছের মূল কাণ্ডের ১৯২৫ সালে অপসারন করা হয়েছে কারণ গাছের পক্ষে একটা মারাত্মক রোগ ফাংগাস রোগে এই প্রাচীন বট আক্রান্ত হয়েছিল। তাই বটগাছটা বাঁচাতে মূল কাণ্ডটা অপসারণ-করলেও যার শাখা প্রশাখা ৪০৪ মিটার এবং ১৫৭০ টা ঝুরিমূল নিয়ে এই বটগাছ বাগানের জন্মলগ্ন থেকে রয়েছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের বর্তমান অ্যাসিসটেন্ট ইনফরমেশান অফিসার রণেন্দ্রমোহন চাটার্জী জানালেন "এই বটগাছ প্রাইমারি স্টেজে একটা খেজুর গাছের উপর হয়। বটগাছটা ক্রমশ খেজুর গাছকে গ্রাস করে ফেলে তারপর একদিন এই উদ্ভিদরাজ্যের একছত্র অধিপতি হয়ে বসলো। সত্যি অধিপতি বটে। এই বটগাছের সবচেয়ে উঁচু শাখাটির উচ্চতা ২৯ ফুট ঐতিহাসিক এই বটগাছটিকে দেখতে শুধু দেশের নয় বিদেশের পর্যটকরাও ছুটে আসেন।

গঙ্গার পারের উপর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ক্যান্টিনে চা খেতে খেতে রণেন্দ্রবাবু বললেন যেখানে বাস আমরা চা খাচ্ছি এটা একটা কামোফ্লেজের মতো। ভাবতে পারেন এর তলা দিয়ে একটা সুরঙ্গ পথ গঙ্গার তলা দিয়ে সোজা ওপারের গার্ডেন রীচ ইলেকট্রীক সাপ্লাইয়ে গিয়ে মিসেছে। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র এখানেই এইরকম ব্যাবস্থা আছে এককালে এই পথে সাহেবরা আসতেন এখন হাজার হাজার ইলেকট্রীক তার গেছে।

ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে একটা বড় গাছের সামনে রনেন্দ্রবাবু দাড়িয়ে গেলেন, বললেন "এটা রেনট্রী" সকাল বেলায় এই গাছের তলায় দাঁড়ালে ঐই গাছের পাতায় জমে থাকা শিশির টুপটাপ করে পরে বলে এই নাম। রনেনবাবুর কথা থেকে জানা গেল, একবার বাগানের এক অধ্যক্ষ স্যার বীয়ারম্যানের একজন বন্ধু এক রেনট্রী দেখতে এসেছিলেন। বীয়ারম্যানের বন্ধুতো গাছ দেখতে মশগুল ওদিকে সূর্য ডুবতে বসেছে, গাছের লম্বা লম্বা ছায়ার আধো অন্ধকার পরিবেশে হঠাৎ বীয়ারম্যান শুনলেন বন্ধুর আর্তনাদ, কোন সময়ে সাঁতরে ওপারে থেকে একটা বড় বাঘ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সুযোগ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শিকারের পর। বীয়ারম্যান দৌড়ে নিজের বন্দুক নিয়ে এসে ফায়ার করলেন। বাঘ মারা পড়ল কিন্তু বন্ধুটিও সাংঘাতিক ভাবে যখম হলো।

এইরকম অজস্র ঘটনা বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিভিন্ন গাছের প্রত্যেকটির কিছু না কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তেমনি আছে ইতিহাস।

বিজ্ঞানী গ্যালেন

দেবব্রত রায়চৌধুরী

আজ তোমাদের, চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক স্বনামধন্য পুরুষ মহা মনীষি গ্যালেনের কিছু কথা বলব।

খ্রীষ্টাব্দ ১৩০ সালে পারগেমন নামে এক শহরে, মনীষি গ্যালেন জন্মগ্রহন করেন। পারগেমন প্রাচীন এশিয়ামাইনরের রোমান রাজ্যের রাজধানী। গ্যালেনের পিতার নাম ছিল মিকন। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন কৃষক ছিলেন। তবে অঙ্ক, দর্শন এবং বিজ্ঞানে তাঁর বেশ ভালই জ্ঞান ছিল। ছেলেবেলায় তাঁর কাছেই গ্যালেন শিক্ষালাভ করেন। পরে একটু বড় হলে, তাঁর পিতা শিক্ষালাভের জন্য তাঁকে পারগেমনের বাছাই করা সব শিক্ষকদের কাছে পাঠান। সেখানে অ্যারিষ্টোটলের লেখা কিছু বই তিনি পড়েন এবং জীববিজ্ঞানের কিছু জ্ঞান আহরণ করেন।

তবে জগতের কাছে তার পরিচয় এক সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার আসাটা হঠাৎই। এর পেছনে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে। শোনা যায় যে, যৌবনের শুরুতে একবার নাকি তাঁর সাংঘাতিক অসুখ হয়েছিল। পুত্রের জীবন সংশয় দেখে, তাঁর পিতা তাকে পারমেগনের অ্যাসক্লেনিয়াসের বিশাল পবিত্র মন্দিরে নিয়ে যান। সেখানে তিনি সন্তানের আরোগ্য লাভের জন্যে সারা রাত প্রার্থনা করেন। কথিত আছে, সেই সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, অ্যাসক্লেপিয়াস তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন, ঠিকই, তবে এই শর্তে যে, তিনি তাঁর পুত্রকে ডাক্তা[illegible] খুবই ভালবাসতেন। সেজন্য [illegible] শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করলেন, সতেরো বছর বয়সে।

এর ঠিক তিন বছর বাদেই তাঁর জীবনে এক নিদারুণ আঘাত আসে। তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। আপনার বলতে আর কেউ না থাকায় তিনি পারগেমন ছেড়ে বিদেশে ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েন এবং নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করতে থাকেন।

একাকী ও নিরবসর গ্যালেন ১৫৭ সালে আবার বাড়ীতে ফিরে এলেন। সেই সময় পারগেমনের অ্যারেনায় (মল্লভূমি) গ্ল্যাডিয়েটরদের বার্ষিক প্রতিযোগীতা শুরুর মুখে। আহত গ্ল্যাডিয়েটরদের ক্ষতস্থান সারিয়ে আবার মল্লভূমিতে ফিরিয়ে আনার জন্য সে সময় একজন দক্ষ চিকিৎসকের প্রয়োজন ছিল। সেজন্য খেলার ভারপ্রাপ্ত প্রধান যাজক গ্যালেনকে ওই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলে, গ্যালেন রাজী হয়ে যান।

কিছুদিন পরে আবার পারগেমন ছেড়ে দেন এবং রোমে চলে আসেন। কিন্তু রোমে তাঁর পক্ষে বাস করা মুস্কিল হয়ে পড়ল। কারণ রোমের চিকিৎসকরা, বহিরাগত নতুন কোন চিকিৎসক রোমে এসে পসার শুরু করুক তা চাইত না। সেজন্য তারা তাঁর পেছনে লাগল, তাঁর সুনামকে তারা এরকমভাবে ধ্বংস করল, যাতে করে তাঁর কাছে কোন রোগীই না আসে।

যখন গ্যালেন চিরতরে রোম ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রায় মনস্থির করে ফেলেছেন তখন রোমান কনসাল ফ্লেবিয়াসের স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোমের শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা কিছুই করতে পারল না। তখন একমাত্র গ্যালেনের চিকিৎসাথেই তিনি খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। এরপর ১৬৮ সালে উত্তর ইতালীতে সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের সেনাদল অসুস্থ হয়ে পড়লে, গ্যালেনই তাদের সারিয়ে তোলেন। এইভাবে চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, রোমেই তিনি পাকাপাকিভাবে রয়ে গেলেন। ডাক্তারীর সঙ্গে সঙ্গে, গবেষণা এবং লেখাও চলতে লাগল।

তাঁর জীবিতকালে তিনি প্রায় চারশোরও বেশী বই লেখেন, কিন্তু হঠাৎ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে তাঁর প্রায় সমস্ত বইগুলোই নষ্ট হয়ে যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গ্যালেন খুব ভেঙ্গে পড়লেন। ১৯২ সালে তিনি আবার পারগেমনে ফিরে আসেন। জীবনের বাকী কটা দিন তিনি তাঁর জন্মস্থানেই কাটিয়ে দেন। অবশেষে ১৯৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। পারগেমনে তার প্রিয় পিতার সমাধির পাশেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

বিস্ময়কর আবিষ্কার

অশোক রায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপ আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ক্যাথোড রশ্মি নেয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে উইলহেলম কোনরাড রনটজেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হেলমোৎসের সুপারিশে উজবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ওর বাবা ছিলেন একজন অবস্থা-পন্ন ব্যবসায়ী। জার্মান পদার্থবিদ রনটজেনও সেই সময়ে ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে কিছু একটা আবিষ্কারের নেশায় মগ্ন ছিলেন। একটি সাধারণ কাগজের খণ্ডে বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইড মেখে রেখে ছিলেন পরীক্ষাগারে। হঠাৎ অ্যাপারাটাসের দিকে চোখ পড়তেই তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি দেখলেন সেই কাগজ খণ্ডটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল এক সবুজাভো আলোকে। বারবার তিনি দেখলেন ব্যাপারটা। তখন তিনি তার আসল প্রজেক্ট বাতিল করে দিয়ে, এই ঘটনার পিছে লেগে থেকে আবিষ্কার করলেন X-ray। ব্যাপারটা ছিল এই রকম, ক্রুকটিউব থেকে অজানা এক অদৃশ্য রশ্মি রাসায়নিক পর্দায় পড়ছে, রাসায়নিক পর্দা সেই রশ্মি শোষণ করছে এবং দৃশ্যমান আলোক হিসাবে তাকে পুনঃ বিকরিত করছে। এবং এই রশ্মির নামকরণ করেন X-Ray.

তোমরা হয়তো জানোনা, জেনো রাখো, যে বছর প্রথম নোবেল প্রাইজ দেওয়া শুরু হয়, সেই বছর অর্থাৎ ১৯০১ সালেই নোবেল পুরস্কারটি পেয়ে-ছিলেন এই মহান বিজ্ঞানী রনটজেন। আরো অবাক হয়ে যাবে শুনলে, নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থ প্রায় 80,000 ডলারের একটি কানাকড়িও তিনি নিজের জন্য নেননি। দান করে গিয়েছিলেন উজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ম্যাজিক রবার

এনিড ব্লাইটন

স্কুলের ছুটির পর কেনেথ ব্যাগ ভর্তি স্কুলের বই পিঠে চাপিয়ে আপন মনে হেটে আসছিলো বাড়ির দিকে। হঠাৎ ওর মনে পড়লো মিঃ ব্রাউন যে অঙ্কটা ওকে ক্লাশে করতে দিয়েছিলেন সেটা ও করে উঠতে পারেনি কারণ অঙ্কটা প্রতিবারই ভুল হচ্ছিলো।

'অঙ্কটা এখনই করে ফেলা উচিত।' নিজের মনেই বললো কেনেথ, তারপর রাস্তার পাশে একটা ঝোপের ধারে গুছিয়ে বসে ব্যাগ থেকে অঙ্কের খাতাটা টেনে বের করলো।

'হায় ভগবান!' কেনেথ চিৎকার করে উঠলো, 'আমি এই জায়গাতেই বার বার অঙ্কটা ভুল করেছি!' কথা শেষ করে কেনেথ সেই ভুল জায়গাটা মুছতে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালো রবার বার করার জন্য। কিন্তু কেনেথের এমন দুর্ভাগ্য যে, সে রবারটা হয় স্কুলে ফেলে এসেছে; না হয় হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক এই সময় ছোট খাটো একটা বুড়ো মানুষ বেরিয়ে এলো ঝোপের ভেতর দিয়ে। বুড়ো লোকটার দেহের রং ঘন বাদামী; মুখ ভর্তি মস্ত লম্বা দাড়ি। আর অদ্ভুত সুন্দর একজোড়া সবুজ চোখ।

'আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?' ক্ষুদে লোকটা হালকা গলায় জানতে চাইলো।

'আমার এখুনি একটা রবার দরকার' কেনেথ বললো, 'সেটা দিয়ে ওই ভুল হয়ে যাওয়া অঙ্কটা মুছে ফেলবো।'

'আমি তোমাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করতে পারি।' কথা শেষ করে ছোট মানুষটি তার মস্ত জোব্বার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে নিয়ে এলো একটা অদ্ভুত সুন্দর রবার! রবারটার একদিকে ছিলো সোনালী রং, অপর দিকে রুপোলী। আর মধ্যের রং ছিলো ঘন নীল। রবারটার ওপরে লেখা ছিলো, 'টুইংকল্'। 'শোনো খোকা,' ছোট মানুষটা বললে, 'এই রবারটার একটা গুণ আছে, তুমি যদি খাতায় কোন ধরণের ভুল করো তাহলে এই রবারকে বললেই হবে রবার মুছে ফেলো; তাহলেই দেখবে রবারটা শুধুমাত্র ভুলের জায়গাটুকু ঘসে দিয়েছে!'

'ঠিক আছে, তাহলে একবার পরীক্ষা করা যাক,' কেনেথ বললো, 'রবার মুছে ফেলো,' কি আশ্চর্য! কেনেথের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রবারটা লাফিয়ে উঠে কেনেথের ভুল হয়ে যাওয়া অঙ্কটার ঠিক যেখানে ভুল হয়েছিলো ঠিক সেই জায়গাটুকুই মুছে দিলো।

'মাফ করো'। ছোটে মানুষটি কেনেথের হাতে রবারটা তুলে দিয়ে বললো, 'তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমার মনে হয় আমার টেলিফোনটা বাজছে। আমি কথা বলেই চলে আসছি।' কথা শেষ করে ছোটো মানুষটা সুড়ুৎ করে ঢুকে গেলো ঝোপের মধ্যে।

ছোট মানুষটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেনেথ চিন্তা করলো, 'আমি যদি এখান থেকে পালিয়ে যাই তাহলে এই আশ্চর্য রবারটা একেবারে আমার হয়ে

যাবে, আর আমি সবাইকে দেখাতে পারবো, আমার কাছে একটা আশ্চর্য রবার আছে।' এরপর কেনেথ দ্বিতীয়বার আর অন্য কোন কিছু চিন্তা করলো না। আশ্চর্য রবারটা পকেটে পুরে নিয়ে স্কুলের ব্যাগ পিঠে চাপিয়ে ও দৌড় মারলো মাঠের ওপর দিয়ে।

একটানা দৌড়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো কেনেথ, ভয়ে ভয়ে পেছনে তাকালো। না কেউ পেছন পেছন আসেনি।

'কালকেই আমি স্কুলের সবাইকে দেখাবো আমার এই আশ্চর্য রবারটা।' কেনেথ মনে মনে ভাবলো, 'কিন্তু মাকে কিছুতেই দেখাবো না। তাহলে মা হয়তো বলবে, যার থেকে তুমি রবারটা নিয়ে এসেছো তাকে রবারটা ফেরত দিয়ে এসো।'

সেই দিন সন্ধ্যার মধ্যেই কেনেথ স্কুলের সমস্ত হোম-ওয়ার্ক সুন্দরভাবে করে ফেললো, খাতায় কোনো কিছু ভুল লেখা হলেই কেনেথ রবারটাকে হুকুম করছিলো, 'রবার মুছে ফেলো,' কেনেথের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রবারটা লাফিয়ে উঠে মুছে দিচ্ছিলো ভুল জায়গাটুকু।

'তুমি কিন্তু হোমওয়ার্ক করতে অনেক সময় নিচ্ছো,' মা নিচ থেকে চিৎকার করে বলল, 'তাড়াতাড়ি করো'।

'মা', কেনেথ উত্তর দিলো, 'আজকে আমি ছ'টা অংক করেছি, ভূগোলের উত্তর লিখেছি, এছাড়া ফরাসী শব্দ লিখেছি, ম্যাপও এঁকেছি।'

'ভালো, অনেক হয়েছে। খাবার সময় হয়েছে, এবার নিচে নেমে এসো।'

কেনেথ আশ্চর্য রবারটা পকেটে পুরে নিচে নেমে এলো। খেতে খেতে ও কিন্তু ক্ষণাক্ষরেও ওর মাকে জানালো না অদ্ভুত রবারটার কথা।

পরের দিন কেনেথ স্কুলের পথে ছুটলো উর্ধ্বশ্বাসে। যেখান দিয়ে সে রোজ যাতায়াত করে কিছুতেই সেই পথ দিয়ে গেলো না, কারণ ঐ যাতায়াতের পথেই পড়ে দাড়িওয়ালা বাদামীরঙা সেই ছোট্ট মানুষটার ঝোপ। সুতরাং কেনেথ স্কুলে পৌঁছলো অন্য একটা রাস্তা ধরে।

স্কুলে পৌঁছে কেনেথ তার বন্ধুদের এক জায়গায় জড়ো করে বললো, 'তোমরা কি আশ্চর্য কোনো জিনিস দেখতে চাও?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, কেন নয়!' সব্বাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো।

কেনেথ এবার ব্যাগ খুলে তার হোমওয়ার্কের খাতা বের করলো। তারপর বললো, 'আমার আজকের হোম-ওয়ার্কে কোথাও একটা ভুল নেই। আমি নিশ্চয়ই আজ হোমওয়ার্কে বেশী নম্বর পাবো।'

'তুমি কি করে এতো সুন্দর হোমওয়ার্ক করলে?' বিল জিজ্ঞাসা করলো, 'আমরা জানি তুমি যে কোন হোমওয়ার্কে কম করে একশো বার খাতায় রবার ঘষো। এই জন্য মিঃ ব্রাউন তোমাকে বলেন মন দিয়ে হোমওয়ার্ক করতে।'

'আমি তোমাদের দেখাতে পারি কি ভাবে এতো সুন্দর হোমওয়ার্ক করতে পেরেছি,' কেনেথ বললো, 'আমি একটা ম্যাজিক রবার পেয়েছি। এই দেখো।' কথা শেষ করে হাতের মুঠো খুললো কেনেথ।

'ম্যাজিক রবার!' সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, 'এটা কি ভাবে কাজ করে? আর তুমি এটা পেলেই বা কোথায়?'

'শোনো, আমি যখন বলবো, রবার মুছে ফেলো, সঙ্গে সঙ্গে রবার আমার ভুল হয়ে যাওয়া জায়গাটা নিজের থেকে ঘসে তুলে দেবে।'

'আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।' বিল বললো।

'ঠিক আছে।' কেনেথ বললো, 'রবার মুছে ফেলো।" কেনেথের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই রবারটা ছিটকে বেরিয়ে গেলো কেনেথের হাত থেকে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে ঘসে তুলে ফেললো কেনেথের হোমওয়ার্ক খাতার প্রতিটি অক্ষর। কেনেথ ভয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'ওফ্ কোকা রবার! এটা তুমি কি করলে! এখন আমি কি করে মিঃ ব্রাউনকে আজকের হোমওয়ার্ক দেখাবো?'

ইতিমধ্যে রবারটা ঘরের খোলা জানালা দিয়ে ছিটকে বাইরের রাস্তায় গিয়ে পড়লো। তারপর অবাক হয়ে চেয়ে থাকা একটা কুকুরের পাশ দিয়ে লাফাতে লাফাতে ফিরে চললো সেই বাদামীরঙা দাড়িওয়ালা ছোট্ট বুড়ো মানুষটার কাছে। স্কুলের ছুটির পর সবাই যখন খেলতে গেলো, কেনেথকে তখন বসে থাকতে হলো হোমওয়ার্কের খাতা নিয়ে। প্রতিটি হোমওয়ার্কেই বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছিলো। দুঃখের বিষয় পুরনো রবারটা কিছুতেই ম্যাজিক রবারের মতো মুছে দিতে পারছিলো না ভুল হয়ে যাওয়া জায়গাটাকে।

কেনেথ ভাবলো, ও আবার সেই ঝোপের কাছে যাবে। তারপর দাড়িওয়ালা ছোট্ট মানুষটাকে খুঁজে বের করে ক্ষমা চাইবে রবারটা না বলে নিয়ে আসার জন্য। তাহলে হয়তো ছোট্ট মানুষটা রবারটা আবার তাকে দিয়ে দিতে পারে। আমার তো মনে হয় এটাই করা উচিত। তোমাদের কি মনে হয় বলো দেখি?

অনুবাদঃ দেবশীষ সেনগুপ্ত

একে চিনে নাও

এর নাম 'হোলেসলির মন্টমোরেন্সি', ডাক নাম মন্টি। আপাতত মন্টিই বিশ্ব রেকর্ড-এর অধিকারী। এর ওজন ২৬৬ পাউন্ড আর বুকের ছাতি মানুষের কোমরের সমান। এই স্বনামধন্য কুকুরটি বেঁচেছিল মাত্র ৯ বছর।

সোহানি সা!
এক তরুনকে ওরা বয়ে নিয়ে আসছে! শিকারের সময় মনে হয় আহত হয়েছে!
ওরা ওকে ডাকিনী চিকিৎসকের কুঁড়েতে নিয়ে গেল। হ্যান্সেরএকমাত্র এই বুড়োদাদের আশেপাশে আমাকে ঘেঁষতে দেয়নি।
ওখানকার ব্যাপার স্যাপার কি আমার কাছে গুপ্ত রাখতে চায়…
ঐ তরুনটি কি সমস্যায় পড়েছে?
বাসন্টি ওয়াহোমি টেলা!
ওর ডানহাতটা কাটা কেন! সৌভাগ্য এখনও ও বেঁচে…
এখন ও কি লাগিয়ে দিয়েছে?
ডাকিনী চিকিৎসক সুন্দর একটা কাপড় ক্ষতস্থানে বেঁধে দিয়েছে!
ওহাসে সোনেটাহ্। মনো সাহি ওয়াসে!
এবার শুরু হলে মন্ত্র বুজরুকি। হিং টিং…
মাননীয় ডাকিনীডাক্তার, তোমার জন্য একটা গরম খবর!

গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর!
বিশ্বাস করতেও পারছি না! হাত জোড়া লেগে গেছে!
তরুণটিকে যখন এনেছিল তখন ওর হাত ছিল না। এখন ওর হাত কম্বল চাপা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করল, ব্যাস নতুন হাত গজিয়ে গেল!
স্বপ্ন দেখছি না আমি! আমার হারানো পা ওরা ফিরিয়ে দিতে পারে!
বিরিক! আমার জীবনে আবার রামধনু উঠবে!
অবশেষে রাত গভীরে…
আহ্ হা!?

[ক্রমশঃ]

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

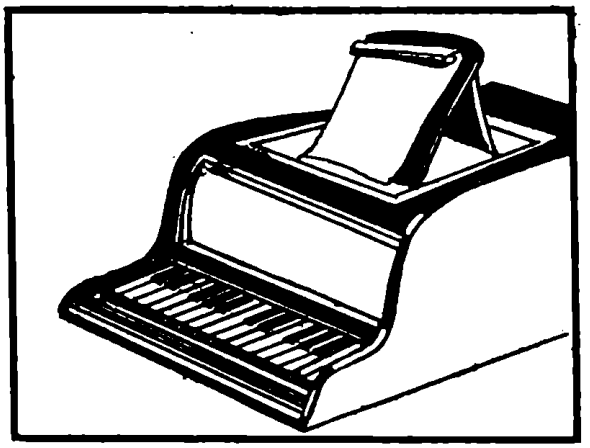

পিয়ানো

আবিষ্কার করেছিলেন ইটালির
বার্টোলেমিও ক্রিস্টোফার
(১৭০৯ সালে)

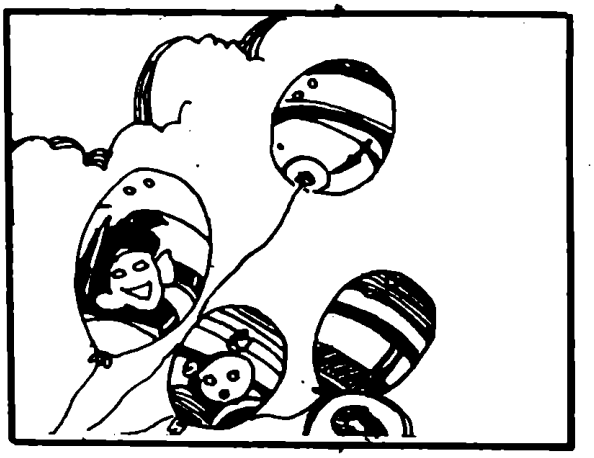

বেলুন

আবিষ্কার করেছিলেন ফ্রান্সের
জে,ই,মন্টগলফিয়ার ও
জে,এম,মন্টগলফিয়ার
(১৭৮৩ সালে)

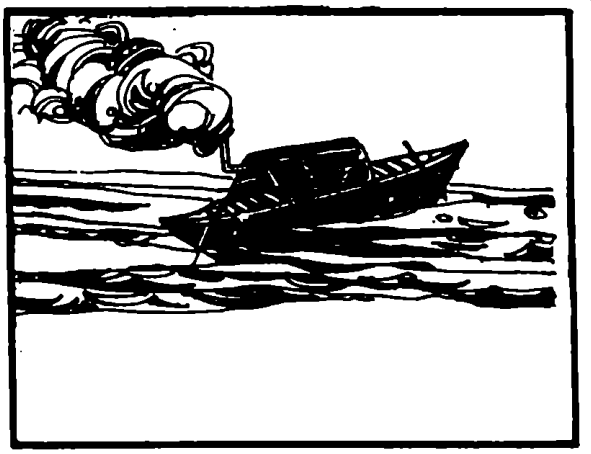

বাষ্পচালিত নৌকা

আবিষ্কার করেন আমেরিকার
রবার্ট ফুলটন
(১৮০৭ সালে)

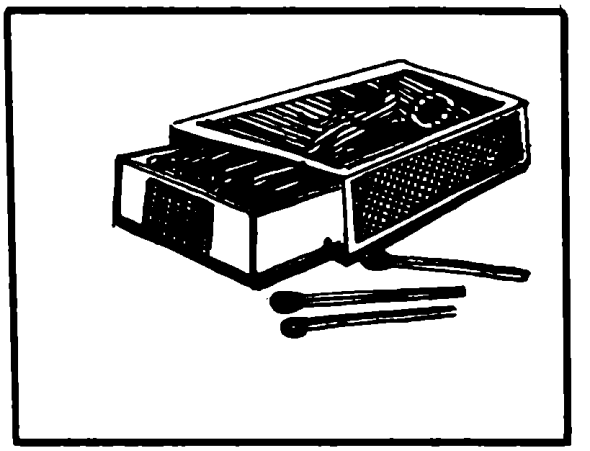

নিরাপদ দেশলাই কাঠি

আবিষ্কার করেন
জে ই লুন্ডস্ট্রম

বলতে পারো ইনি কোন দেশের মানুষ?
উত্তর আগামী সংখ্যায়।

আজও রহস্য

বর্মামুলুকের রহস্যময় জলাভূমি

ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

…বারমুডা ট্রাংগেল আর পাঙস পাসের লেক অব নো রিটার্ন দুই-ই অজানা রহস্যে ভরা। বারমুডা ট্রাংগেলে থেকে গত ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ ইস্তক কম পক্ষে অন্ততঃ এক হাজার মানুষ তাদের জাহাজ সমেত নিখোঁজ হয়েছে। আর লেক অব নো রিটার্ন থেকে নিখোঁজ হয়েছে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দেই অন্ততঃ ছ'হাজার মানুষ, তাদের রসদ কামান ও অস্ত্রশস্ত্র সমেত। এটা সরকারী হিসাব, কারো মনগড়া হিসাব নয়। ভারী অদ্ভুত ব্যাপার—তাই না? ইদানীং কালের বিজ্ঞানীরা এ'দুইয়েরই কোনো কিনারা করতে পারে নি। সুতরাং ব্যাপার যে গোলমালের তা সহজেই অনুমেয়।

বারমুডা ট্রাংগেলের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু লেক অব নো রিটার্নের কথা তো ছাড়া যায় না কোনো মতেই। এতো আমাদের ঘরের কাছেই—এতো আমাদের একাবারে ঘরের কাছের রহস্য। সুতরাং এর একটা আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। নিতান্তই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এ' রহস্যের আজো কোনো সমাধান হলো না। জাতীয় সরকারও এই অজানা রহস্যের কিনারায় অপারক। তাই এ অঞ্চলকে নিষিদ্ধ এলাকা বলে ঘোষনা করা হয়েছে এবং এ অঞ্চলকে প্রবেশের নিষেধের নোটিশ জারি করা হয়েছে সরকার থেকেই। সুতরাং অজানা রহস্য এখানকার অজানাই রয়ে গেছে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ। পৃথিবীব্যাপি যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠলো। জাপানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে ভারতকে তার হাত থেকে বাঁচাতে মিত্রশক্তি ইংরেজ জাপানকে পর্যুদস্ত করার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষ থেকে জাপানে যাবার একটা সোজা রাস্তা করে নিতে চাইল। এবং তৈরীও করল তারা পাঙস পাস থেকে চীনের মাঝখান দিয়ে জাপানে যাতায়াতের সহজতম পথ। এই রাস্তা যিনি জানালেন তাঁর নাম হচ্ছে জেনারেল স্টিলওয়েল। পাঙস পাস পার হয়ে বর্মা মলুকের মাঝখান দিয়ে একটা জলাভূমি পেরিয়ে তৈরী হলো এই সোজা রাস্তা জাপানে পেঁছিবার। কিন্তু দুঃখের বিষয় বৃটিশের প্রথম সৈন্যদল ওই অঞ্চল পার হয়ে জাপানে পেঁছাতে পারে নি—জলা ভূমির মাঝেই তারা রহস্যজনকভাবে হারিয়ে গেল। সঙ্গে ছিল তাদের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র। এবং আরো বিস্ময়ের কাণ্ড জাপানী সৈন্যদলও ওই রহস্যময় অঞ্চলে রহস্যজনকভাবেই হারিয়ে গিয়েছিল। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। জেনারেলের স্মৃতিকথায় এ' কাহিনীর উল্লেখ আছে এবং বর্মামুলুকের জাতীয় সরকারের নথিপত্রেও এ' রহস্যজনক কাহিনীর আনুসৃচিক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা আছে।

মিলিটারী কনভয় পাঠানো হলো একের পর এক। কিন্তু তারাও হারিয়ে গেল এই অঞ্চলে অত্যন্ত রহস্য-জনক ভাবেই। অবশেষে জেনারেল টিস্লওয়েল নিজেই তৈরী হলেন এই রহস্যময় জলাভূমি পার হতে এবং বললেন ঃ 'অল রাইট, আমাকেই দেখিতে হইবে ব্যাপারটা কি হইতেছে। তাঁর একজন অধস্তন সৈনিক তাঁর হাত চেপে ধরে তাঁকে এই পথে না যেতে মানা করল ঃ তোমার যীশুর দোহাই সাহেব ; ও পথে তুমি যেও না। সাহেব বললেন খুবই মর্মাহত হয়েই ঃ পাঙস পাস পার হইতে না হইতেই আমাদের সৈন্যদল অদৃশ্য হইয়া কোথায় যাইতেছে। ভারী আশ্চর্য্য তো।

ওটা রহস্যেই ঢাকা থাক সাহেব। ওখানে গিয়ে আর বিপদ বাড়িও না।

'তাহাই হোক! যীশু তোমার মঙ্গল করুন। তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইলে। ধন্যবাদ তোমাকে!' আসলে মনে মনে খুবই ভীত হয়ে পড়েছিলেন জেনারেল সাহেব। অথচ তাঁর চোখের সামনেই এতগুলো লোক তাদের রসদ আর অস্ত্রশস্ত্র সমেত হারিয়ে গেল। কিছুই করার রইল না তাঁর। রহস্যময় লেক অব নো রিটার্নের অজানা রহস্যকেই মেনে নিতে হলো তাঁকে বিনা দ্বিধায়। আশ্চর্য্য।

সুতরাং লেক অব নো রিটার্নের রহস্য আজো কেউ সমাধানের পথ মাত্রও খুঁজে পেল না। পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীরাও এই অজানা রহস্যের কিনারা করতে পারে নি। অজানা অলৌকিক এই রহস্য তাই আজো অন্ধকারেই আবৃত রয়ে গেছে। এই পাঙস পাসের পথ এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এ অঞ্চল পরিত্যক্ত বলে নোটিশও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকার থেকেই। এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে ওখানকার সরকার একটি বড় নোটিশ বোর্ড লটকে দিয়েছেন জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে। তাতে লিখিত আছে এই কথা কটি, খুবই বড় হরফে এবং স্পষ্ট ভাবেই ঃ 'LAKE OF NO RETURN. NO ADMISSION. DANGER.' ব্যাস ও' পথে তাই আর কেউই যেতে সাহস করে না, ওখানকার আদিবাসীরাও না।

১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু ভারতীয় হেলিকাপটার করে ওই জলাভূমি ঘুরে এসেছেন। তাঁদের সেই অভিজ্ঞতার কথাই জানানো হচ্ছে ঃ 'সব সময়েই এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি অদ্ভুতভাবে ও দ্রুত গতিতে বদলাচ্ছে। এটা তাই সরোবর না জলাভূমি কিংবা জংগলাকীর্ণ স্থান তাই আজো সঠিকভাবে নির্ধারিত হলো না।' এই জলাভূমির ফটো তুলতেও তারা সমর্থ হয় নি (তাই তাঁদের একান্ত অভিমত এখানে কোনো অজানা রহস্য রশ্মিমালা সর্বদাই বিকিরিত হচ্ছে এবং তারই ফলে ফটো তোলা পর্য্যন্ত সম্ভব হচ্ছে না আসলে।)

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার তাঁরা লক্ষ্য করেছেন ওই অঞ্চল দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধ যৌবনশক্তি লাভ করে এবং যুবকেরা কৈশোরের লুপ্ত শক্তি ফিরে পায় ; তবে এটা খুব দীর্ঘস্থায়ী নয় ; নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী বলা যেতে পারে। এবং এটাও সত্য যে কোনো বৃদ্ধ পাইলট এই জলাভূমি দিয়ে উড়ে যাবার পর তার পাকা চুল কালো হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি অচিরেই যৌবন শক্তি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন, ক্ষণকালের অবশ্য! মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর বৃদ্ধত্ব আবার ফিরে পেয়েছিলেন, যৌবনশক্তি হারিয়ে। সব চাইতে আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হলো ওখানকার ধারে কাছের আদিবাসীদের সাক্ষ্যদান এবং এই অঞ্চল সম্বন্ধে তাদের বিস্ময়কর বক্তব্য। তা হচ্ছে আসলে এইরূপ ঃ গভীর রাতে অথবা দ্বিপ্রহরে তারা ওই জলাভূমি থেকে বহু মানুষের কলকোলাহল মুখর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিধ্বনি শুনেছে। তবে সবসময় তা তাদের শ্রুতিগোচর হয় না। গভীর রাতে অথবা দ্বিপ্রহরেই ওই প্রতিধ্বনি তাদের কর্ণগোচর হয়ে থাকে আজো। হাজার মানুষের কর্মাকোলাহল মুখর ওই অঞ্চল কিন্তু জনশূন্য একটি জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি মাত্র ; সেখানে কোনো মানুষ তো দূরের কথা কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব পর্যন্ত কেউই খুঁজে পায় নি!

ব্যাপারটা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক—তাই না? অথচ আশ্চর্য্যের ব্যাপার যারা ওই অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে সড়ক বানিয়েছিল সেই ১০,০০০ শ্রমিকের একজনও কিন্তু ওই জলাভূমি থেকে নিখোঁজ হয় নি। তোমরা কি এই অজানা রহস্যের সমাধান করতে পারো। চেষ্টা করে দেখো না, কিংবা অভিযানে নেমে পড়ো না। এই রহস্যের সমাধান সূত্র বার করতে পারলে তোমরা তো অমর হয়ে থাকবেই সেই সঙ্গে আপামর-জনসাধারনেরও কল্যাণ সাধিত হবে। কিন্তু সাবধান, তোমরা যেন আবার হারিয়ে যেও না ওই জলাভূমিতে।

কলকাতায় প্রথম ঘূর্ণি ঝড়

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার জন্মলগ্ন থেকেই যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, মহামারী, মন্বন্তর, মিছিল, গণ-আন্দোলন অনেক কারণেই স্মরণীয় কিন্তু ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখের কলকাতা স্মরণীয় একটি ভিন্ন কারণে। এই দিন রাত্রে শহর কলকাতার বুকে ঘটে গেছলো এক ধুন্ধুমার ঘটনা। যার জন্য দায়ী ছিল না কোন রাজা বাদশা, কোন শহরবাসী মানুষ।

১৭৩৭ খ্রীঃ এর ১১ই অক্টোবর রাত্রে গঙ্গাসাগরে উঠেছিল এক ভয়ংকর ঝড় (Cyclone)। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে দেখতে সেই ঝড় আছড়ে পড়েছিল শহর কলকাতার বুকে। ঝড় তার সঙ্গে ভীষণ ভূমিকম্প। গঙ্গাসাগরের উত্তর দিকের প্রায় এক'শ ক্রোশ অঞ্চল কয়েক ঘন্টার মধ্যে লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেছলো ওই এক রাত্রের ঝড় আর ভূমিকম্পে। সঙ্গে কলকাতাও।

ওই দিন রাত্রে প্রকৃতির করাল দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল কলকাতা শহর। কলকাতার গঙ্গার জল ৪০ ফুট উঁচু হয়ে জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দিয়েছিল শহর কলকাতাকে। আর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সেকালের কলকাতার নাম করা দুটি বাড়ি। প্রথমটি সেযুগের কুমোরটুলীর নাম করা জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের ন'চুড়ো-অলা নবরত্ন মন্দির। যার চুড়োগুলি উচ্চতায় মনুমেণ্টকেও ছাড়িয়ে যেতো। ১৬৫ ফুট। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে গড়া এই মন্দিরটির আকাশচুম্বি চুড়োগুলি ১১ই অক্টোবরের মহাপ্রলয়ের রাত্রে ভেঙে পড়ে।

আর দ্বিতীয় যে নামকরা বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেটি একটি ইংরেজদের গীর্জা। 'সেণ্ট এ্যান চার্চ'। ইং ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনস্থ বিশপের উদ্যোগে এই গীর্জাটি রাণী কুইন এ্যান এর নামে উৎসর্গীকৃত হয়। অষ্টবাহু কোনাকৃতি ছিল এই গীর্জার চুড়ো। কথিত আছে, রেঃ গার্ভাস বেলামী যিনি তথাকথিত সিরাজের 'অন্ধকূপ' কারাগারে মারা যান, ইনিই ছিলেন এই সেণ্ট এ্যান চার্চের শেষ ধর্মযাজক। ইংরেজদের তৈরি এই প্রথম গীর্জাটি ওই ১৭০৭ সালের ১১ই অক্টোবরের ঝড়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেছলো।

ওই দিনের ভয়াবহ ঝড়ে গঙ্গার মাঝি মাল্লারা ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে ছিল সবচেয়ে বেশী। ইংরেজ কোম্পানীর আট খানা জাহাজ এবং তিনখানা ডাচ্ জাহাজ লোকজন মালপত্র সমেত বঙ্গোপসাগরে জলমগ্ন হয়েছিল। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল সাগর সংলগ্ন গঙ্গায়। এ প্রসঙ্গে 'প্রাচীন কলিকাতার পরিচয়' এর লেখক হরিহর শেঠ মহাশয় 'Gentleman's Magazine' পত্রিকায় বিবরণী দিয়ে বলেছেন—"ঝটিকা এত প্রবল হইয়াছিল যে, অনেক বড় বড় নৌকাও গাছের ওপর উঠিয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, এই দৈবদুর্বিপাকে সর্ব সমেত ২০,০০০ জাহাজ নৌকা, মুলুপ প্রভৃতি জলমগ্ন হয় এবং তিন লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয়।"

'কলিকাতার কথা' গ্রন্থের লেখক (পি, এন, মল্লিক) মহাশয় এই ঝড়ের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন—"১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর রাত্রে ঐ ঝড় ভূমিকম্পে নদীর জল চল্লিশ ফিট উঁচু ও নৌকা জাহাজ লোকজনাদি নষ্ট হয়। স্থলে গির্জা, ঘর বাড়ি, গাছপালা, জীব-জন্তুরও মৃত্যু হয়। উহাতে পর বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল।

চতুর ইংরাজ কোম্পানি সেই সময়ে সকলের দুঃখ দূর করিবার বিধিমত চেষ্টা করিয়া সকলকে বাধ্য করিয়াছিল।" মল্লিক মহাশয় তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন মন্ত্রনা সভার সভ্য স্যার ফ্রান্সিস রাসেল বর্নিত (১৭৩৭ খ্রীঃ এর ১১ অক্টোবর) ঝড়ের বিবরণ দিয়ে বলেছেন—"ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মন্ত্রনা সভার সভ্য স্যার ফ্রান্সিস রাসেলের বর্ণিত ঝড়ের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া গেল—আমি কখনো সেই ঝড়ের বিষম সন্ সন্ শব্দের সহিত মুশলধারে বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত আজি ভুলিতে পারি না। প্রতি মুহূর্তেই বোধ হইতে লাগিল যে, যেন সকলে বাড়ী চাপা পড়িয়া সমাধিস্থ হইব। সকলে সেই ভয়, উদ্বেগ ও মৃত্যুর আশঙ্কায় সমগ্র রাত্রি বসিয়া কাটাইলাম। প্রভাতের দৃশ্য অতীব ভয়ংকর। পূর্ব দিনের রাত্রের ঝড়ে ডিউক অব ডর্সেট নামক জাহাজ ভিন্ন ছোট বড় ঊনত্রিশ জাহাজাদি, কতগুলি নদীতে ডুবিয়াছে, তীরে ভাঙিয়া আড় হইয়া পড়িয়াছে, ও কতগুলি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া চূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বৃক্ষ সমুদায় রাস্তার দুই ধারে জুড়িয়া পড়িয়া আছে। আর আর সমস্ত মাটিতে সমভূমি, ইংরাজ ও বাঙালীর বাড়ীর মধ্যে দশ বার খানি একেবারে ধূলিশায়ী হইয়াছে। নদীর স্রোতে বাঘ, গণ্ডার ও গৃহপালিত পশু পক্ষী মৃতাবস্থায় ভাসিতেছে, ও কতক পথিমধ্যে পড়িয়া আছে।···পাঁচ ঘণ্টায় নদীর জল ১৫ ইঞ্চি বাড়িয়াছিল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প। ঝড়টি বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ষাট লিগ পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী স্থানে ব্যাপৃত হয়। উহাতে অনেক ছোট জাহাজ, নৌকা, দুইশত ফিট দূরবর্তী গ্রামের মধ্যে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।"

রেভাঃ উইলিয়ম কেরী তাঁর 'Good old day of Honarable John company' গ্রন্থে এই ঝড়ের একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"In the night of the 11th October 1737, There happend a furious hurricane at the mouth of Ganges, which reached sixty leagues up the river, There was at the some time a violent earthquake, which threw down a great many houses along the river side; in Golgota (i.e calcutta) alone, a port belonging to the English, two hundred houses were thrown down and the high and magnificent steeple of the English church sunk in to the ground without breaking."

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট—অর্থাৎ কলকাতার জনক চার্নক সাহেবের পালতোলা জাহাজ খানা হুগলী নদীর ঢেউয়ের ওপর ভাসতে ভাসতে যেদিন পাকাপাকি ভাবে সুতানুটির ঘাটে এসে ভিড়েছিল—এদিন পর্যন্ত ১৭৩৭ এর ১১ই অক্টোবরের মতো ঝড় শহর কলকাতার জীবনে আর ঘটেনি।

এর দীর্ঘদিন পর ১৮৬৫ খ্রীঃ ৫ই অক্টোবর কলকাতা তথা বাঙলা দেশের বুকে আরেকবার ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এই ঝড়ে কলকাতায় ১০০ পাকা বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং ৪০,৬০০ খড়ের ঘর উড়ে গিয়েছিল। এই ঝড়ে হাওড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনা জেলায় যথাক্রমে ২০০০ মানুষ ও ১২০০ পশু, ২০,০০০ মানুষ ও ৪০,০০০ পশু, এবং ১২,০০০ ও শতকরা ৮০টি পশু নিহত হয়।

এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে দুটি মহা ঝড় কলকাতার ওপর বয়ে গেছলো সে দুটির তারিখ হলো, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ও ১৬ অক্টোবর এবং ১৮৯৭ এর ১২ জুন (এদিন ঝড়ের সঙ্গে প্রচণ্ড ভূমিকম্পও হয়েছিল। যদিও উত্তর বঙ্গে এর প্রকোপ ছিল সব চেয়ে বেশী)।

সবচেয়ে উঁচু বাঁধ ঃ

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাঁধ তৈরি হয়েছে সুইজারল্যাণ্ডে ডিক্রেন্স নদীর উপরে। নদীর তলথেকে এর উচ্চতা ৯৩৫ ফুট। জেনে রাখো বিশ্বের দীর্ঘকায় অট্টালিকাগুলির অন্যতম নিউইয়র্কের ক্রাইসলার বিল্ডিংয়ের সমান এই বাঁধটি। এতে খরচ হয়েছে ৭, ৭৯০, ০০০ ঘন গজ সিমেণ্ট।

সব্যসাচী সেনশর্মা

পৃথিবীর প্রাচীন প্রস্তর

৩৮ লক্ষ বছরের পুরনো কিছু প্রস্তর খণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের এই কলকাতারই পশ্চিম প্রান্তে। সাদা গ্রানাইটের কালো ফুটকিওয়ালা এই প্রস্তরটি আবিষ্কার করেছেন রোচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙালী ভূতত্ত্ববিদ, আশীষ বসু। এরকমই পুরনো কিছু প্রস্তর আবিষ্কৃত হয়েছিল কয়েক বছর আগে গ্রীনল্যান্ডে। কিন্তু আশীষ বসুর ধারণা ওর চেয়েও পুরনো পাথর লুকিয়ে আছে ভারতের পূর্বপ্রান্তে। এই আবিষ্কারের ফলে ভূতত্ত্ববিদরা মনে করেন পৃথিবীর বয়স ৪৬০ লক্ষ বছর।

এটাই সর্ববিদিত যে, পৃথিবী তৈরী হবার কিছু পরেই পুরো পৃথিবীটাই গলে গিয়ে কেলাসিত হয়ে প্রস্তরে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বসুর পরীক্ষায় প্রমানিত হয়, ম্যান্টেলের নিম্নাংশ গলেনি, সেটা অপরিবর্তিত ছিল পৃথিবীর দেহগঠনের সময়। তিনি আশা রাখেন একদিন ম্যান্টেলের নিম্নাংশ থেকে সেই প্রস্তর আবিষ্কৃত হবে।

খাবার টেবিলে অদৃশ্য ছুরি

এই অদৃশ্য ছুরির সাহায্যে তুমি নারকেল দুটুকরো করতে পারো, কাঁকড়া কাটতে পারো, এমনকি মুরগীকেও খণ্ড বিখণ্ড করতে পারবে নিখুঁতভাবে। আবার খাবার খাওয়ার সময়ও ব্যবহার করতে পারবে। দরকার হলে এই ছুরি দিয়ে ভুক্তাবশেষ চেঁচে পরিষ্কার করতেও পারবে।

এই বিস্ময়কর ছুরিটি [illegible]। ছোট হাতলওয়ালা এই ছুরিটি ধোওয়ার দরকার নেই, দরকার নেই বীজানুমুক্ত করার। কারণ এর ফলাটা তৈরী হচ্ছে অদৃশ বিদ্যুতের দ্বারা। এই আশ্চর্য্য ছুরির আবিষ্কর্তা হলেন মধ্য পশ্চিম বায়োলেসার ইনস্টিটিউট। বাজারে ছাড়ার আগে এরা শেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে কিনতে পাবে এই আশ্চর্য্য আলাদিন ছুরি। আপাততঃ একটি সমস্যাই বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যাটি হল ঃ যে মুহূর্তে ছুরি দিয়ে chrome objects বিচ্ছুরিত হবে সেই মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ওই সংস্থার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এই সমস্যার মোকাবিলা করা হচ্ছে শীঘ্রই। বাজারে এলে এমন ছুরির চাহিদা বেড়ে যাবে কারণ সাধারণ ছুরির চাইতে এই বিস্ময়কর ছুরি অনেক দ্রুত যে কোন জিনিস কেটে ফেলতে পারে।

ক্যাঙ্গারু ইঁদুর

এসো, একটি আশ্চর্য্য প্রাণীর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এই প্রাণীটির নাম ক্যাঙ্গারু ইঁদুর, বাস আমেরিকার মরুভূমিতে। একফোঁটা জল না খেয়ে দিব্যি এই জীবটি সারা জীবন বেঁচে থাকতে পারে। আসলে এই প্রাণীটি জলীয় পদার্থ গ্রহণ করে রসাল ঘাস ও ক্যাকটাসের কাঁটা থেকে। কিন্তু শুষ্ক বীজ থেকেও সহজে জলীয় পদার্থ তৈরী করে। বীজ ভেঙে চিনিকে পরিণত করে কার্বণ ডাই-অক্সাইড (CO_2) শক্তি ও জলে।

প্রথম কম্পিউটার

প্রথম ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার তৈরী করা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে, এর ওজন ছিল ৩০ টন। এর মধ্যে ছিল ১৮,০০০ ভ্যাকুয়াম টিউব। অপারেট করত লাগত পাঁচজন মানুষ। একে বলা হত ENIAC। আর মাইক্রো কম্পিউটার তৈরী করতে আজ খরচ পড়ছে মাত্র ১০ ডলার (অর্থাৎ ৮০ টাকা) অথচ একই ক্ষমতার অধিকারী এই রকম একটি কম্পিউটার গড়তে এক দশক আগে খরচ পড়ত ১ লক্ষ ডলার (অর্থাৎ ৮০ লক্ষ টাকা প্রায়)।

।ণ্যমূল্যে গ্রাহক হওয়ার সুযোগ

প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

সুমন চ্যাটার্জী

ধনেশ ঃ ইণ্ডিয়ান পায়েড হর্ণবিল

ছবির পাখিটি প্রিয়াত্মজ বংশের এক প্রজাতি—নাম ধনেশ, হিন্দী—ধার্নাচিড়ি, ইংরেজী—ইণ্ডিয়ান পায়েড হর্ণবিল।

ধনেশ লম্বায় ৪৭ সেমি (৩৫ ইঞ্চি), অর্থাৎ আকারে চিলের চেয়ে কিছু বড়। স্ত্রী-পুরুষ প্রায় একই রকম দেখতে। আকারে স্ত্রী-পাখি কিছুটা ছোট। স্ত্রী-পুরুষের বুকের নিম্নাংশ থেকে পেট, তলপেট, লেজের মাঝের জোড়া বাদে, ডানার ধার ও ডগা সাদা, বাকী পালক সবুজাভ কালো। চঞ্চু মোম-কালো হলুদ, চঞ্চু ও শিরস্থানের গোড়া কালো এবং শিরস্থানের মাঝখানটাও কালো। স্ত্রী পাখির চঞ্চু ও শিরস্থানে ততটা কালো নেই।

ভারত থেকে পূর্বে ইন্দোচীন মালয়েশিয়া এবং দক্ষিন চীন হচ্ছে এদের বাসস্থান। ভারতে দুটি প্রজাতি। প্রথম উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বাংলা-দেশ। দ্বিতীয়—'মালাবার পায়েড হর্ণবিল'—মধ্যভারত ও বিহার।

প্রধানতঃ ফলভোজী। কিন্তু টিকটিকি, গিরগিটি, ব্যাঙ, নেংটি ইঁদুর ও পাখির ছানাতেও আপত্তি নেই।

ধনেশ প্রজননকাল ছাড়া অন সময়ে দলবদ্ধ হয়ে বড়ো এবং ছোট দু'রকমের গাছের ফল যেমন খায় তেমনি মাটিতে নেমে শামুক, কীটপতঙ্গ এবং সরীসৃপও ধরে খায়। পক্ষীতত্ত্ববিদ চার্লস ইংগ্লিশ মাছও ধরে খেতে দেখেছেন। এক কথায় বলা যায় ধনেশ সর্বভুক। ধনেশের ওড়ার ধরণটা অদ্ভুত রকমের। ওড়ার সময়ে ডানার ঝাপটে বেশী শব্দ হয়। ধনেশের ডাক কর্কশ। ধনেশ খুব সহজেই পোষ মানে। সবকিছু খেতে অভ্যস্থ বলে বাঁচানো মোটেই শক্ত নয়। বন্দীদশায় ধনেশ ২৫—৩০ কি তারও বেশী বছর বাঁচে।

ধনেশের প্রজননকাল মার্চ থেকে জুন। স্ত্রী ধনেশ কোনো বড়ো গাছের কান্ডে স্বাভাবিক ভাবে কোন গর্ত পেলে সেটাকেই বাসা হিসাবে বেছে নেয়। দেখা যায় বছরের পর বছর একই স্থানে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তুলতে। সেই গর্তে স্ত্রী পাখি নিজেকে ভিতরে রেখে নিজের বিষ্ঠা ও পুরুষের আনা ভিজে মাটি দিয়ে এক প্লাস্টার তৈরি করে এবং চঞ্চুর চেপ্টা দিকটা কার্নিকের মতো করে এই প্লাস্টার দিয়ে গর্তের মুখ বোজায়। কেবল একটা ছিদ্র রাখে পুরুষের আনা খাবার গ্রহণ ও নিজের বিষ্ঠা ত্যাগ করার পর বাইরে ফেলে দেবার জন্য। এই সময় স্ত্রী-পাখি ডিম পাড়ে ২৫টি। ডিমের মান—লম্বায় ১.৯৬ ইঞ্চি ও চওড়ায় ১.৩৯ ইঞ্চি। ডিম থেকে বাচ্চা হতে ২৮—৪০ দিন লাগে। এই সময় পুরুষ বাইরে থেকে ফল এনে স্ত্রী-পাখির চঞ্চুতে ফেলে দেয়। অধিক খাটুনির জন্য এই সময় পুরুষ খুব রোগা হয়ে যায়। ছানাদের বড়ো হতে সময় লাগে ১৫ থেকে ২১—২২ দিন। পুরুষই এই সময় স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ করে। গর্তের মধ্যে কিছুদিন থাকার পর সন্তানরা যখন নিজেরাই সমর্থ হয়েছে বলে স্ত্রীপাখি বুঝতে পারে, তখন দেওয়াল ভেঙ্গে তাদের মুক্ত করে দেয়।

প্রতিযোগীতার বিচারক ছিলেন ঃ শ্রীঅজয় হোম
প্রথম হয়েছো ঃ সুমন চ্যাটার্জী, বাকুড়া
দ্বিতীয় হয়েছো ঃ সুবীর মৈত্র, সুখচর

অজয় ঘোষ

ধাঁধা

শেখ সাহেবের তেল সমস্যা

স্থানীয় লোকগুলোর কথা শুনে বিখ্যাত পর্যটক শেখ খুল্লম খুল্লা, আলখাল্লা সরিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। সামনে ধূ ধূ করছে সাহারা। পাশে সাড়ে তিনখানা অ্যামবাসাডরের সমান একটা মার্সিডিজ বেনজ্।

এতক্ষণ আমিই গাড়ীটা চালাচ্ছিলাম। তেল ফুরিয়ে যেতে, পেট্রোল পাম্পটাতে গাড়ী দাঁড় করিয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। শেখ সাহেবের অবস্থা দেখে আমিও একটু নার্ভাস হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা কি? যতই হোক্ আরবী শেখ, মরুভূমিকে ভয় পাওয়ার পাত্র নয়। আর তেলের চিন্তা? ফুঃ আরবের ভিখিরীরাও করে না। তাহলে! গাড়ী থেকে নেমে আস্তে আস্তে শেখ সাহেবের পাশে বসলাম। 'কি ব্যাপার, যাবেন না?

'না হে বোস, আর যাওয়া হল না।'

'কেন?'

'এই পেট্রোল পাম্পটাই শেষ পেট্রোলপাম্প খোলা আছে। মরুভূমির মধ্যে সমস্ত পেট্রোলপাম্পের কর্মচারীরা স্ট্রাইক্ করেছে। ওদের নাকি নাকের মধ্যে বালি ঢুকে ভীষণ হাঁচি হচ্ছে, অনেকদিন ধরে বলা সত্ত্বেও মালিকপক্ষ এর কোনো ব্যবস্থা। [illegible] তেল পাঠানোই বন্ধ করে দেব'।' একটু থেমে আবার বললেন, 'পুরো হাজার কিলোমিটার রাস্তা, মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। একটা উপায় বের করো বোস্।'

হঠাৎই মাথায় একটা প্ল্যান এল।

'ইউরেকা, ইউরেকা!' বলে লাফিয়ে উঠলাম।

'আরে, চেল্লাচ্ছো কেন?

'এই পেট্রোল পাম্পটায় কত তেল আছে?'

'তা প্রায় হাজার লিটার।' উত্তর দিল এক সাগরেদ।

'মানে প্রায় চার হাজার কিলোমিটার যাওয়া যাবে। ঢাউস গাড়িটা একটু বেশি তেল খায় তো।'

'শোনো, গাড়িতে একশ পঁচিশ লিটারের বেশি তেল কোনোভাবেই নিতে পারবে না। এটা অবশ্য সেখ সাহেবের কুসংস্কার। গাড়ির ট্যাঙ্ক ছাড়া কিছুতেই গাড়ির ভেতর তেল নেবেন না, সেখ সাহেবের কথাটা গায়ে না মেখেই বললাম, 'আমার অনেকগুলো পেট্রোল রাখার জায়গা চাই।'

'এ আর এমন কি কথা? সামনের দোকানটাতেই তো বেশ বড় বড় ড্রাম পাওয়া যায়।' একটা বাচ্ছা ছেলে বলল। ততক্ষণে আমাদের চারপাশে ভিড় জমে গেছে।

শেখ সাহেব এবার একটু রেগেই বললেন, 'বোস, তুমি তো ভালই জান, আমি গাড়ীতে ট্যাঙ্ক ছাড়া তেল নিতে দেবো না। আর যদিও বা নাও, হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেবার মতো তেল গাড়িতে আঁটবে না।'

পাত্তা না দিয়েই বললুম 'চলুন, তা হলে বেরিয়ে পড়ি। অনেক সময় লাগবে।'

মরুভূমিটা শেষ পর্যন্ত পার হয়েছিলুম। ট্যাঙ্ক ছাড়া গাড়ীতে এক ফোঁটাও তেল না নিয়ে। শেখ সাহেব তো আনন্দে গাড়ীটাই আমায় দিয়ে দিলেন!

নতে বোস গপ্প শেষ করল।

থাকতে না পেরে পার্থ বলল, 'নতেদা, গাড়ীটা কই?

'আগে কি করে মরুভূমিটা পার হলাম ভেবে বার কর, তারপর গাড়ীর খোঁজ করবি।'

বলে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নতেদা পগার পাড়।

বাপী বলল, গপ্প মারলো বটে, কিন্তু একটা ধাঁধা ও দিয়ে গেল। (উত্তর পরের সংখ্যায়।)

পত্রপাঠ

প্রঃ 'কিশোর বিস্ময়' পড়ে আপনাদের প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাই এবং পরবর্তী সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করছি। তবে আরো কিছু ফিচার যুক্ত করলে পত্রিকাটি আরো উৎকৃষ্ট হবে, যেমন 'তোমাদের জিজ্ঞাসা' এখানে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশ্ন পাঠালে উত্তর দেওয়া হবে। আর একটি বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি তৈরীর প্রণালী। 'বিজ্ঞানের ক্রোড়পত্র' আমাদের খুব ভালো লেগেছে। এছাড়া বিস্ময়ের নোটবই, বিশ্বের বিস্ময়, আবিষ্কার ও আবিষ্কারক, শব্দছক, ধাঁধা এগুলো যেন নিয়মিত থাকে। সুজিত বিশ্বাস ও প্রদীপ বিশ্বাস, সাহেব পাড়া, ব্যান্ডেল।

উঃ আগামী সংখ্যা থেকেই প্রশ্নোত্তরের একটি বিভাগ খোলা হচ্ছে। এতে তোমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের যে কোন প্রশ্ন পাঠাতে পারো। ক্রোড়পত্র ভালো লেগেছে জেনে খুশী হলাম ও ভবিষ্যতে রঙিন ও আরো আকর্ষনীয় করে তোলা হবে।

প্রঃ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইউএফও' নিবন্ধটিতে উড়ন্ত চাকীর জন্মবর্ষ হিসেবে ১৯৫৭ সালকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ওই স্থলে ১৯৪৭ সাল বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

কাজল ভট্টাচার্য, দমদম রোড, কলিকাতা-৭০০০০২

উঃ হ্যা। ঐ সময়টা হবে ১৯৪৭ সাল।

প্রঃ কিশোর বিস্ময়ের প্রথম দুটি সংখ্যা পড়ে আমাদের খুব ভালো লাগল। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা, আজও রহস্য, বিজ্ঞানের ভেলকি লেখাগুলো পড়ে দারুণ ভালো লেগেছে। আরো কয়েকটি বিভাগ খোলার জন্য অনুরোধ করছি, সেগুলো হলো—বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ও বুদ্ধির খেলা, ভেবে ভেবে উত্তর দাও, ছবি দেখে বলো, জীবজন্তু, পাশুপাখী এবং রোগ নিরাময়।

সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ, মিঠু ঘোষ, সমরেশ ঘোষ, মিনতি ঘোষ, মামুদপুর, ২৪ পরগণা।

উঃ তোমাদের অনুরোধগুলি যথাসময়ে পূরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রঃ কিশোর বিস্ময় পাঠ করলাম, দুর্দান্ত লাগল। পত্রিকাটি কিশোরদের চিত্ত জয় করবে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় মূল্যবান পত্রিকাটির মূল্য যথেষ্ট স্বল্পই। এর প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

হঠাৎ করে পেলাম হাতে লাগল বিস্ময়,
চাহি যেন পত্রিকাটি সবার প্রিয় হয়।
অলীক যাহা ছাড়িয়া তাহা বিজ্ঞানকে মানো,
সেই কথাটি নানাছলে বলছে এরা জানো!

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-১৪

উঃ তোমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করলাম।

প্রঃ কিশোর বিস্ময় পড়ে ভীষণ ভালো লাগল। আগামী সংখ্যাগুলোর দিকে চেয়ে বাকী দিনগুলো কাটাবো। এক নিশ্বাসে পড়ার মত এমন কিশোর পত্রিকা খুব কমই আছে তা জোড় গলায় বলা যায়।

আলি আকবর, মালিহাটি, মুর্শিদাবাদ,

প্রঃ কিশোর বিস্ময় পড়ছি। খুব ভালো লাগছে। এধরণের পত্রিকা আমি অনেক দিন খুঁজছিলাম। ঠিক পেয়ে গেলাম। ছবিতে গল্পগুলো খুব আকর্ষনীয়। কার কাহিনী এবং যে চিত্ররূপ দিয়েছে তা জানতে পারলাম না। আশাকরি কিশোরদের পাতা পরের সংখ্যায় দেখতে পাব।

শরকৃষ্ণ চট্টসূর্য্য, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

উঃ ছবির কাহিনীকারও চিত্রশিল্পীর নাম চিত্রকাহিনীর শেষ কিস্তিতে জানিয়ে দেওয়া হবে। আগামী সংখ্যা থেকেই কিশোরদের পাতা দেখতে পাবে।

নতুন কিশোর জিজ্ঞাসা প্রশ্নোত্তরের বিভাগ খোলা হচ্ছে আগামী সংখ্যা থেকে। অতএব তোমাদের সংশয় সন্দেহ দুর করতে, অজানা জিনিস জানতে, জানা বিষয় ঝালিয়ে নিতে আজই পাঠিয়ে দাও প্রশ্নবাণ। সঠিক উত্তর প্রকাশিত হবে কিশোর জিজ্ঞাসা বিভাগে। তবে প্রশ্নের সঙ্গে স্পষ্ট অক্ষরে চাই নাম, ঠিকানা আর বয়স।

কিশোর বিস্ময়

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর বিস্ময় প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২'৫০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ২৫ টাকা। গ্রাহকদের জন্য শারদসংখ্যার অর্ধমূল্য।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। বুক পোষ্টে গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- এম, ও, বা সরাসরি নগদ পাঠাতে হবে কিশোর বিস্ময়ের নামে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাকমাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যাপিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

প্রচারসম্পাদক ঃ কিশোর বিস্ময়
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

Kishore Vismoi August'84 Rs. 2·50 Regd. No. WB/EC-263

ছোটদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি আশ্চর্য পত্রিকা

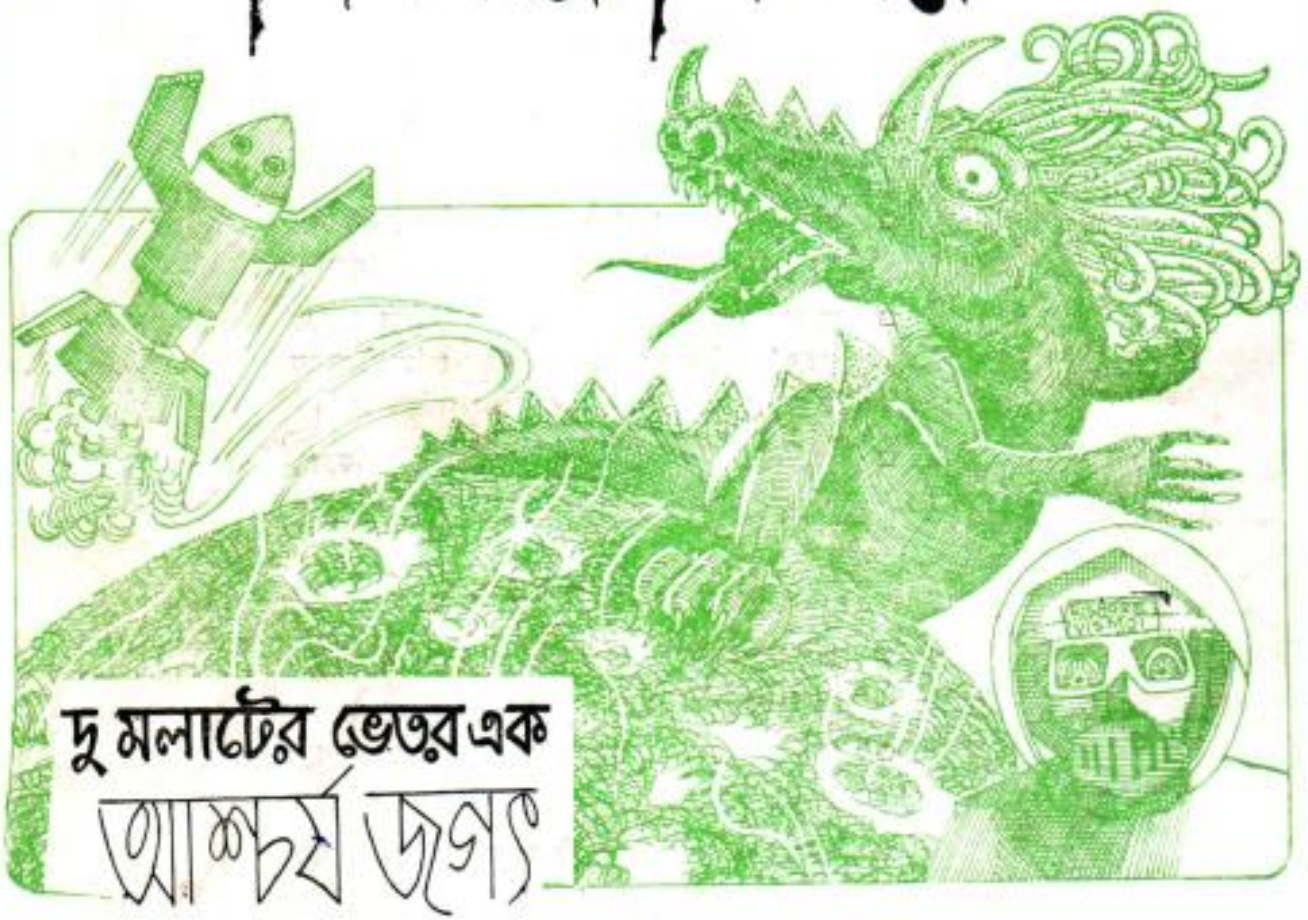

কিশোর বিস্ময়

পূজা সংখ্যায়

৫ টি উপন্যাস লিখছেন

সমরেশ মজুমদার ● অদ্রীশ বর্ধন ● সিদ্ধার্থ ঘোষ
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আর জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন সব রচনা ও কান্ডকারখানা যা অন্য কোন পত্রিকায় পাবেই না। পূর্ণাঙ্গ সূচীর জন্য ধৈর্য্য ধরো•••খবরের কাগজের পাতায়•••